নুহাশ এবং আলাদিনের আশ্চর্য চেরাগ

হুমায়ূন আহমেদ

সূচিপত্র

১. শিল-পাটা.....2
২. নুহাশকে ডাক্তারের কাছে.....25
৩. নুহাশ স্কুলে.....48
৪. ছুটির শেষ দিন.....59
৫. অ্যাপার্টমেন্টটা খুব সুন্দর.....66
৬. চারিদিক অন্ধকার.....70
৭. নুহাশের চোখ লাল.....86
৮. নুহাশের রিপোর্টগুলি.....94

১. শিল-পাটা

নুহাশ এবং আলাদিনের আশ্চর্য চেরাগ – হমায়ূন আহমেদ

জানালার কাছে কে একজন চেঁচাচ্ছে শিল-পাটা ধার করাইবেন? শিল-পাটা ধার। লোকটার গলার স্বর খুব মিষ্টি, মনে হচ্ছে গান গাচ্ছে। কেমন টেনে টেনে বলছে শিল-পাটা ধা—-র।

নুহাশের বিছানা জানালার পাশে। সে 'সাত ভূতের কাণ্ড' নামের একটা বই পড়ছিল। বই ফেলে জানালার শিক ধরে দাঁড়াল। উঁচু গলায় ডাকল, অ্যাই অ্যাই।

লোকটা অবাক হয়ে তাকাল। রোগা একজন মানুষ। পরনে সবুজ রঙের লুঙ্গি, গায়ে ময়লা গেঞ্জি। হাতে ছোট্ট একটা পুঁটলি। লোকটা বিস্মিত হয়ে বলল, শিল-পাটা ধার করাইবেন?

নুহাশ বলল, হ্যাঁ করাব। আপনি আসুন। কাছে আসুন।

লোকটা কাছে আসছে না। মনে হয় নুহাশকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। নুহাশের বয়স মাত্র নয়। হলি ক্রস স্কুলে ক্লাস ফোরে পড়ে। আজ তাদের স্কুল খোলা। সে স্কুলে যায় নি। গতকালও যায় নি, তার আগের দিনও না। কারণ নুহাশের শরীর ভাল না। গত দুদিন জ্বর ছিল। আজ অবশ্যি জ্বর নেই।

নুহাশ বলল, কাছে আসছেন না কেন? কাছে আসুন।

লোকটা এগিয়ে এল। অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলল, শিল-পাটা ধার করাইবেন?

নুহাশের খুব মজা লাগছে। লোকটা তার সঙ্গে কেমন আপনি আপনি করে কথা বলছে। কেউ তাকে আপনি বলে না। ক্লাস ওয়ান, ক্লাস টু-র মেয়েগুলিও না। কিন্তু ওদের তো আপনি বলা উচিত। সে বয়সে তাদের চেয়ে বড়।

শিল-পাটা ধার করাইবেন?

হ্যাঁ করাব।

দশ টেকা লাগব।

দশ টাকাই দেব। আমার কাছে টাকা আছে।

লোকটা মনে হল তার কথা বিশ্বাস করছে না। কেমন করে যেন তাকাচ্ছে। ছোটদের কোন কাজে বিরক্ত হলে বড়রা যে রকম করে তাকায়, সে রকম করে তাকাচ্ছে। সে বোধহয় ভাবছে-এই মেয়েটির টাকা নেই। সে মিথ্যা কথা বলছে। নুহাশের টাকা কিন্তু আছে। জমানো টাকা। হরলিক্সের কাচের বৈয়মে ভরা। প্রথমে সে টাকাগুলি রেখেছিল তার ছোট্ট কাঠের বাক্সটায়। ছোটচাচা বললেন, ও কি নুহাশ! টাকা কেউ এভাবে রাখে? টাকা রাখতে হয় এমনভাবে যেন সবাই দেখতে পায়। টাকা দেখতেও আনন্দ আছে। কাচের বৈয়মে ভরে রাখ।

টাকা দেখলে আনন্দ হয় কেন চাচা?

টাকা হচ্ছে ফুলের মত। কিংবা কে জানে হয়ত ফুলের চেয়েও সুন্দর। এখন বুঝবি না। বড় হয়ে বুঝবি।

ছোটচাচা কথাবার্তাই এ রকম। কিছু বলেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলবে, সারগর্ভ বাণী দিলাম। এই বাণীর মর্ম এখন বুঝবি না। বড় হয়ে বুঝবি।

নুহাশ বড় হবার জন্যে অপেক্ষা করছে। বড় হতে আর কতদিন লাগবে কে জানে। এস.এস.সি. পাস করার পর কি বড় হয়? ছোটচাচাকে জিজ্ঞেস করেছিল। চাচা বললেন, কত বছর বয়সে বড় হয় এটা বলা খুব মুশকিল। ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। কেউ কেউ দশ বছরেই বড় হয়ে যায়। আবার কেউ কেউ আছে নব্বই বছরেও হয় না। বয়স যত বাড়ে বুদ্ধিশুদ্ধি তত কমে।

ছোটচাচা কথার কোন আগামাথা নেই। নুহাশের বাবার ধারণা–তাঁর ভাইটির মাথায় ব্রেইন বলে কোন পদার্থ নেই। মাথাটা সাবানের ফেনা দিয়ে ভর্তি। তাও গায়ে-মাখা সাবানের ফেনা না। কাপড়-ধোয়া সাবানের ফেনা। কে জানে হতেও পারে। বাবা তো আর মিথ্যা কথা বলবেন না। জেনেশুনেই বলেছেন। তাছাড়া বাবা হলেন টিচার। টিচাররা মিথ্যা বলতে পারে না। নিয়ম নেই।

লোকটা সরু চোখে তাকিয়ে আছে। এবার সে নিঃশ্বাস ফেলে চলে যেতে ধরল। নুহাশ বলল, ও কি চলে যাচ্ছেন কেন? আপনাকে তো বলেছি। আমার কাছে দশ টাকা আছে। হরলিক্সের কৌটায় ভরা আছে। দাঁড়ান, এনে দিচ্ছি। চকচকে টাকা নেবেন, না ময়লা টাকা নেবেন? আমার কাছে দুটা দশ টাকার নোট আছে–একটা চকচকে নোট, একটা ময়লা।

লোকটা জবাব দিল না। নুহাশ হরলিক্সের কৌটা খুলে চকচকে নোটটাই বের করল। চকচকে নোট পেলে সবাই খুশি হয়। লোকটাও খুশি হবে। লোকটা খুশি হলে হেসে ফেলবে। ছোটচাচা বলেছেন, শোন নুহাশ, তুই যদি সারাদিনে তিনজন মানুষকে হাসাতে পারিস তাহলে ধরে নিতে হবে–তুই অসাধারণ একজন মানুষ।

মাত্র তিনজনকে হাসাতে পারলেই হবে?

হ্যাঁ মাত্র তিনজন। কিংবা একজনকেই তিনবার। সময়সীমা হচ্ছে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

তিনজনকে হাসানো তো খুব সহজ চাচা।

মোটেই সহজ না। ভয়ংকর কঠিন কাজ। গল্প বলে হাসাননা নয়। তুই এমন কোন কাজ করবি যা দেখে খুশি হয়ে মানুষটা হাসবে। যত সহজ ভাবছিস তত সহজ না। কঠিন কর্ম। পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যারা সারাজীবনেও একজনকে খুশি করতে পারে নি।

কাজটা যে কঠিন নুহাশ এখন তা জানে। যেমন আজ সে এখন পর্যন্ত কাউকে হাসাতে পারেনি। সকাল এগারোটা বাজে, দিনের অর্ধেক তো চলেই গেল। নুহাশ জানালা দিয়ে চকচকে নোটটা বের করে রেখেছে, কিন্তু লোকটা হাসছে না। নুহাশ বলল, নিন। নিচ্ছেন না কেন?

ধার করাইবেন?

অবশ্যই করাব।

লোকটা হাত বাড়িয়ে টাকা নিল। নুহাশ বলল, খুব ভাল করে ধার করবেন।

অবশ্যই ভাল কইরা ধার দিমু আম্মা। অবশ্যই দিমু।

শিল-পাটা ধার ব্যাপারটা কি নুহাশ জানে না। ছুরি কাঁচি ধার দেয়া হয় তা সে জানে। সে দেখেছেও–চাকতির মত একটা জিনিস আছে, রিকশা যেভাবে প্যাডেল করা হয়, সেভাবে প্যাডেল করে জিনিসটা ঘুরানো হয়। বঁটি, ছুরি, কাঁচি, চাকতির কাছে ধরলেই আগুনের ফুলকি বের হয়। এর নাম ধার দেয়া।

শিল-পাটা ধার দিতে নুহাশ কখনো দেখে নি। আজ হয়ত দেখা যাবে। নুহাশ বলল, ধার দেবার যন্ত্রপাতি কোথায়?

আছে, যন্ত্রপাতি আছে। এই ব্যাগের মইদ্যে আছে।

বের করুন তো একটু দেখি।

লোকটা কিছু বের করতে পারল না। তার আগেই নুহাশদের কাজের মেয়ে-মুনার-মা ঘরে ঢুকে আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার দিল-আফা!

নুহাশ বলল, চিৎকার করছ কেন?

আপনেরে না আম্মা নিষেধ করছে–জানালা দিয়া কারো সাথে কথা বলন যাইব না। নিষেধ করছে না? বলেন করে নাই?

আমি তো অকারণে কথা বলছি না। কাজের কথা বলছি।

আপনার আবার কি কাজের কথা?

ঐ লোকটা খুব ভাল শিল-পাটা ধার করতে পারে। ব্যাগের মধ্যে তার সব যন্ত্রপাতি আছে। সে আমাদের শিল-পাটা ধার করবে।

মুনার মা লোকটার দিকে তাকিয়ে কর্কশ গলায় বলল, যান কইলাম। যান। এই বাড়িত শিল-পাটার কারবারই নাই-মসলা গুঁড়া হয় মেশিনে। যান কইলাম।

লোকটা বিব্রত ভঙ্গিতে বলল, খুকী আম্মা আমারে দশটা টেকা দিছেন।

মুনার-মা হতভম্ব গলায় বলল, ও আল্লা, এর মধ্যে টেকাও দিয়া দিছে। দেন, ফিরত দেন। টেকা ফিরত দেন কইলাম। বাচ্চা মানুষ পাইয়া টেকা নেওন। ছিঃ ছিঃ।

লোকটা মুখ করুণ করে দশ টাকার নোটটা এগিয়ে দিল। নুহাশ বলল, না, টাকা ফেরত দিতে হবে না।

মুনার মা বলল, এইটা কোন কথা হইল আফা? এক টেকা দুই টেকা হইলে একটা বিষয় ছিল। দশ টেকা। দশ টেকা কি সহজ জিনিস? দশ টেকা রোজগার করতে শইলের রক্ত পানি হইয়া যায়।

নুহাশ বলল, আমি বললাম টাকা ফেরত দিতে হবে না। সে জানালা দিয়ে গলা বের করে বলল, এই যে শুনুন। আপনি এখন চলে যান। আরেকদিন আসবেন-তখন আমরা শিল-পাটা ধার করাব। আমি পাশে বসে দেখব।

জ্বি আইচ্ছা আম্মা।

কাজটা কি খুব কঠিন?

কঠিন না, আবার ধরেন সহজও না। নিয়ম-কানুন আছে।

আমি কি শিখতে পারব?

অবশ্যই শিখতে পারবেন। তবে আম্মা এইসব ছোট কাজ আপনে কেন শিখবেন? আপনে শিখবেন-বড় বড় কাজ। ভাল কাজ।

কিন্তু আমি আপনারে শিখায়ে দিব।

কাজটা শেখা হয়ে গেলে আমিও মানুষের শিল-পাটা ধার করে বেড়াব।

লোকটা হেসে ফেলল। বোঝাই যাচ্ছে, সে খুশি হয়ে হাসছে। মুনার মা কঠিন গলায় বলল, জানালার সামনে খাড়াইয়া হাইসেন না। যান কইলাম। না যাইলে অসুবিধা আছে। মুনার-মা খট করে জানালা বন্ধ করে দিল।

নুহাস ক্ষীণ গলায় বলল, জানালা বন্ধ করছ কেন বুয়া?

আম্মা জানালা বন্ধ রাখতে বলছে। আম্মা আপনারে বলছে শুইয়া বিশ্রাম করতে। দুধ আনতেছি, খান। খাইয়া শুইয়া থাকেন।

দুধ খাবেন না।

এই কথা মুখেও আইনেন না আফা। দুধ আনতেছি, এক টান দিয়া দুধ শেষ করন লাগব।

মুনার-মা শুধু দুধ আনল না, একটা পিরিচে কয়েক টুকরা পেঁপেও নিয়ে এল। নুহাশের ধারণা পৃথিবীতে সবচে খারাপ খাবারের মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে দুধ, দুনম্বর হল পেঁপে। তিন নম্বরে অনেকগুলি আছে-করলা ভাজি, শাকসবজি। অথচ এগুলি না-কি বেশি বেশি করে খেতে হবে। এগুলির মধ্যে নাকি সবচে বেশি ভিটামিন। খারাপ খারাপ জিনিসগুলির মধ্যে ভিটামিন থাকে আর ভাল জিনিসগুলির মধ্যে কেন থাকে না? এ রকম পচা নিয়ম কেন? আইসক্রিমের ভেতর যদি সবগুলি ভিটামিন থাকত তাহলে কত ভাল হত। সকালে, বিকেলে আর রাতে তিন বাটি আইসক্রিম খেয়ে ফেললে ঝামেলা শেষ।

নুহাশ এক টুকরা পেঁপে মুখে দিল। মনে হচ্ছে বমি হয়ে যাবে। সে দুধের গ্লাসে ছোট্ট করে চুমুক দিল। আজকের দুধটা অন্য দিনের চেয়েও খারাপ, সব ভাসছে। আজ মনে হচ্ছে বমি হবেই হবে। পেটের মধ্যে কেমন যেন করছে। ইশ, সে যদি তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যেতে পারত! বড়দের এসব খেতে হয় না। বড়রা তাদের ইচ্ছেমত খাবার খেতে পারে।

বুয়া।

কি?

তুমি ঐগুলি রেখে যাও। আমি পরে খাব।

না। আপনে আমার সামনে খাইবেন। মানুষে খাওন পায় না, ক্ষিধা পেটে পথে পথে ঘুরে, আর আপনে ...।

জানালাটা খুলে দাও বুয়া।

না। আম্মা বইল্যা দিছে জানালা বন থাকব। জানালা কি মানুষ বন্ধ করে রাখার জন্যে বানায়? মানুষ জানালা বানায় খুলে রাখার জন্যে। টিভিতে খবরের সময় ওরা কি গান গায়–সব কটা জানালা খুলে দাও না।

আফা, দুধটা শেষ করেন তো। আফনে খালি ঝামেলা করেন।

বুয়া আমার বমি আসছে।

আসলে আসব। আফনে লম্বা একটা টান দেন।

নুহাশ দুধের গ্লাসে লম্বা টান দিল এবং তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বমি করে মেঝে ভাসিয়ে ফেলল। সে লজ্জিত গলায় বলল, তোমাকে বলেছিলাম না বুয়া আমার বমি হবে। এখন দেখলে তো ঘর কেমন নষ্ট হল। তোমারই তো কষ্ট হবে। পরিষ্কার করতে হবে।

দুপুরে নুহাশ কিছু খেল না। কারণ দুপুরে তার জ্বর এল। বেশ ভাল জ্বর। থার্মোমিটার দিলে একশ দুই কিংবা তিন হবে। বুয়া থার্মোমিটার দেখতে জানে না। নুহাশও জানে না। কিন্তু সে বুঝতে পারছে জ্বর অনেক বেশি। যখন জ্বর অনেক বেশি হয় তখন শরীর হালকা হয়ে যায়। কিন্তু মাথা হয়ে যায় ভারী। মনে হয় মাথাটা বিছানায় পড়ে আছে, আর শরীরটা আকাশে উঠে যাচ্ছে।

মুনার-মা শুকনো গলায় বলল, মাথায় পানি দিমু আফা?

না।

একটু দেই। শইল বেশি গরম ঠেকতাছে।

তাহলে দাও।

একজন ডাক্তার খবর দিয়া আনি আফা। আপনে একলা একলা থাকতে পারবেন?

ডাক্তার লাগবে না। বাবার আসার সময় হয়ে গেছে। সাড়ে তিনটা বাজে।

মুনার-মা ড্রয়ার থেকে থার্মোমিটার বের করে অনেকক্ষণ ঝাঁকিয়ে নুহাশের কাছে নিয়ে এল।

বগলে থামটার দেন দেহি আফা। জ্বরটা দেহি।

জ্বর তো তুমি দেখতে পার না। আমিও পারি না।

আপনে দেন দেহি।

নুহাশ থার্মোমিটার দিল। জ্বর বোধ হয় আরো বাড়ছে। কানের কাছে কেমন ভোঁ-ভোঁ শব্দ হচ্ছে। জ্বর খুব বেড়ে গেলে এমন শব্দ হয়। নুহাশ তার বাবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। তার বাবা চারটার ভেতর চলে আসবেন। পাঁচটার সময় নুহাশকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন। এরকম কথা হয়ে আছে। মা রোজ পাঁচটার মধ্যে চলে আসেন। চারটার সময় তাঁর অফিস শেষ হয়। বাসায় আসতে আসতে বাজে পাঁচটা। আজ মার আসতে দেরি হবে। কারণ অফিসের শেষে তিনি তাঁর অফিসের এক কলিগের বাড়িতে যাবেন। রাতে সে বাড়িতে তার খাবার দাওয়াত। কলিগ কি জিনিস নুহাশ জানত না। মাকে জিজ্ঞেস করে জেনেছে। মা বলেছেন, কলিগ হল সহকর্মী এক সঙ্গে যারা কাজ করে তারা সবাই কলিগ। নুহাশ বলেছে, তাহলে ভিখিরীরা সবাই কলিগ, তাই না মা?

উদ্ভট কথা বলবে না নুহাশ। উদ্ভট কথাবার্তা তুমি তোমার বাবার সঙ্গে বলো কিংবা তোমার ছোটচাচার সঙ্গে বলল, আমার সঙ্গে না। ভিখিরী হচ্ছে ভিখিরী। ওরা কাজ করে না।

মাকে নুহাশ অসম্ভব ভালবাসে। রেগে যখন মা তর্ক করেন তখন মাকে তার সবচে বেশি ভাল লাগে। এমিতেই মা খুব ফর্সা। রেগে গেলে গাল লাল টুকটুকে হয়ে যায়। তখন মাকে যা সুন্দর লাগে! বাবা রাগলে কেমন লাগে নুহাশ জানে না। কারণ বাবাকে সে কখনো রাগতে দেখি নি।

মা যখন খুব রেগে বাবার সঙ্গে তর্ক করেন তখনো বাবা হাসেন। হাসতে হাসতে বলেন, কোন লাভ নেই রেবেকা, তুমি আমাকে রাগাতে পারবে না। তুমি যত ইচ্ছা হৈচৈ কর, চেঁচামেচি কর, আমি শুধু মিটিমিটি হাসব। চেষ্টা করে দেখ। যদি সত্যি কোনদিন রাগাতে পার–তাহলে নগদ পাঁচশ টাকা পাবে। নগদ পাঁচশ দেব-সব চকচকে দশ টাকার নোট।

নুহাশের খুব ইচ্ছা করে বাবাকে রাগিয়ে চকচকে দশ টাকার নোটে নগদ পাঁচশ টাকা নিয়ে নেয়। টাকাটা পেলে সে হরলিক্সের কৌটায় রেখে দিত। কিন্তু বাবাকে রাগানো আসলেই মুশকিল-বুয়া একবার বাবার হাতঘড়ি টেবিল থেকে ফেলে ভেঙে ফেলল। বাবা সেই ভাঙা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন। মা রাগী গলায় বললেন, তুমি হাসছ কেন? দামী ঘড়ি ভেঙে ফেলেছে এর মধ্যে হাসির এলিমেন্ট কি আছে?

আছে। হাসির একটা এলিমেন্ট এর মধ্যেও আছে।

বল আমাকে, আমি জানতে চাই হাসির এলিমেন্টটা কি?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ- ঘণ্টার এবং মিনিটের কাঁটা ঠিক বারোটায়। অর্থাৎ ঘড়িরও বারোটা বেজেছে। হা হা হা ...।

বাবা শব্দ করে হাসতে লাগলেন। ভাবটা এরকম যেন এমন মজার ব্যাপার তার জীবনে এর আগে ঘটে নি।

.

ছটা বেজে গেছে। নুহাশের বাবা সিটি কলেজের ইতিহাসের লেকচারার মিনহাজ উদ্দিন এখনো ফেরে নি। মুনার-মা মোড়ের ডিসপেনসারি থেকে এক ডাক্তারকে নিয়ে এসেছে। ডাক্তার সাহেব জ্বর দেখলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, একশ তিন পয়েন্ট পাঁচ।

পয়েন্ট পাঁচ ব্যাপারটা কি নুহাশ বুঝতে পারছে না। ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু মনে হচ্ছে জিজ্ঞেস করলেই উনি রেগে যাবেন। কিছু কিছু মানুষ আছে প্রশ্ন করলেই রেগে যান। ডাক্তার সাহেবকে সেই রকম মনে হচ্ছে। তা ছাড়া উনি এমিতেই রেগে আছেন। রাগী রাগী গলায় বললেন, এমন অসুস্থ বাচ্চা ফেলে বাবা-মা দুজনই চলে গেলেন। এটা কেমন কথা? নুহাশের ইচ্ছে করছিল, বলে-উনারা যখন যান তখন আমার অসুখ ছিল না। কিন্তু সে কিছু বলল না। ডাক্তার সাহেব যখন বললেন, এখন কেমন লাগছে খুকী? সে বলল, ভাল লাগছে। আসলে তার ভাল লাগছিল না। খুব খারাপ লাগছিল। তবু সে মিথ্যা করে বলল, ভাল লাগছে। মিথ্যা বলাটা ঠিক হয় নি। মিথ্যা বললে পাপ হয়। তবে ছোটচাচা বলেছেন–সব মিথ্যায় পাপ হয় না। কিছু কিছু মিথ্যা আছে যেগুলি শুনলে মানুষ খুশি হয়। সেইসব মিথ্যায় পাপ হয় না। বরং খানিকটা পুণ্য হয়।

ডাক্তার সাহেব গম্ভীর মুখে বললেন, জ্বর কমানোর জন্যে অষুধ দিয়ে গেলাম। সিরাপ। তিন চামচ এখন খাও। ছঘণ্টা পর আবার তিন চামচ খাবে।

জ্বি আচ্ছা।

মাথায় পানি ঢালতে হবে। আর গা স্পঞ্জ করে দিতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত জ্বর একশ না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত মাথায় পানি ঢালতে হবে।

নুহাশ বলল, আপনার ভিজিট কত ডাক্তার সাহেব?

ডাক্তার সাহেব চমকে উঠে বললেন, কেন?

আমার কাছে টাকা আছে। হরলিক্সের কৌটায় আছে।

বাইরের কলে গেলে একশ টাকা ভিজিট নেই। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কমও নেই। তোমার ক্ষেত্রে কম নেব।

কত?

এক টাকা দাও। পুরানো ময়লা নোট না। ঝকঝকে নোট দাও।

নুহাশ এক টাকার একটা নোট বের করল। ডাক্তার সাহেব হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে টাকাটা মানিব্যাগে রাখলেন। আশ্চর্য এত গম্ভীর একজন মানুষ কি সুন্দর করে হেসে ফেলল। তাহলে আজ দিনে নুহাশ কজনকে হাসাতে পারল? দুজনকে। আরো একজন বাকি রয়েছে।

ডাক্তার সাহেব বললেন, খুকী, আমি এখন যাচ্ছি। যা করতে বলছি করবে। আর রাত দশটার ভেতর যদি তোমার বাবা-মা কেউ না আসেন, আমাকে খবর দেবে।

খবর পেয়ে আপনি কি করবেন?

কি করব বুঝতে পারছি না। খুব খারাপ কিছু করে বসতে পারি। আমি আবার ভয়ংকর রাগী মানুষ। কাজের মেয়েটা গেল কোথায়? তাকে বললাম মাথায় পানি ঢালতে। সে করছে কী? এ বাড়ির সবাই দেখি খুব ঢিলাঢালা। এসব তো সহ্য করা যাবে না। ওর নাম কি?

ওর নাম আমি জানি না। ওকে সবাই মুনার-মা ডাকে।

মুনা'স মাদার? ভাগ্য ভাল সে আমার বাড়িতে চাকরি করছে না। আমার বাড়িতে চাকরি করলে এতক্ষণে চাকরি নট হয়ে যেত।

মুনার-মা চায়ের কাপ ট্রেতে সাজিয়ে ঢুকল। সে ডাক্তার সাহেবের জন্যে এতক্ষণ চা বানাচ্ছিল। ডাক্তার সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, তোমাকে বলা হয়েছে রুগীর মাথায় পানি ঢালতে। তুমি বানাচ্ছ চা। তুমি নিতান্ত ভাগ্যবতী যে আমার বাড়িতে চাকরি করছ না। আমার বাড়িতে চাকরি করলে এতক্ষণে তোমার চাকরি নট হয়ে যেত। চা-টাও তো ভাল হয় নি। ঠাণ্ডা হয়ে আছে। এখনো চা বানানো শেখ নি? তাহলে এতদিনে কি শিখেছ?

ডাক্তার সাহেব এক চুমুকে চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। গম্ভীর গলায় বললেন, রাত দশটার মধ্যে এই মেয়ের বাবা-মা না ফিরলে তুমি এক দৌড়ে আমাকে খবর দেবে। আমি রাত এগারোটা পর্যন্ত চেম্বারে থাকি। মনে থাকবে?

জ্বি-থাকব।

এখন আর দেরি না করে পানি ঢালা শুরু কর। খুকী আমি যাচ্ছি।

নুহাশ খুব উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। যা রাগী ডাক্তার। বাবা মা রাত দশটার মধ্যে না এলে তাঁকে খবর দিতে হবে। তিনি এসে বাবা মার সঙ্গে হয়ত একটা ঝগড়াই বাঁধিয়ে বসবেন।

.

নুহাশের মা রেবেকা এগারোটা বাজার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে বাসায় ফিরল। অসুস্থ মেয়েকে ফেলে এতক্ষণ বাইরে থাকতে তার নিজেরই খারাপ লাগছিল। বাধ্য হয়ে থাকতে হয়েছে। ভদ্রলোক খাবারই দিয়েছেন দশটার পর।

রেবেকা সব সময় ঘরে ঢুকেই কিছুক্ষণ মুনার মার সঙ্গে ঝগড়া করে। কেন ঘর পরিষ্কার হয় নি? কেন আলনা অগোছালো? মেঝেতে ধুলা কেন? চায়ের কাপটা কাত হয়ে আছে কেন? চেয়ারের উপর ভেজা তোয়ালে কেন?

আজ রেবেকা ঝগড়া করল না। নুহাশের খুব জ্বর এসেছিল শুনে চুপ করে গেল। নুহাশের ঘরে ঢুকে তার কপালে হাত রাখল। নুহাশ জেগেই ছিল। কিন্তু ভান করল যেন সে গভীর ঘুমে।

কই জ্বর তো নাই।

মুনার-মা বলল, এখন কমছে। মাথাত পানি ঢালছি। তারপরে ডাক্তার সাব অষুধ দিছেন।

ডাক্তার সাব অষুধ দিয়েছেন মানে। ডাক্তার পেলে কোথায়?

আমি খবর দিয়া আনছি আম্মা। পাড়ার ডাক্তার।

আলগা মাতব্বরি কর কেন মুনার-মা? তোমাকে আলগা মাতব্বরি করতে কে বলেছে?

জ্বর খুব বেশি ছিল আম্মা।

পানির মত ঠাণ্ডা গা। বলে জ্বর বেশি ছিল। কাকে না কাকে ডেকে নিয়ে এসছে। আমি লক্ষবার বলেছি–আমরা বাসায় না থাকলে কোন বাইরের লোক যেন ঘরে না ঢুকে। তোমাকে কি এই কথা অসংখ্যবার বলা হয় নি?

জে আম্মা বলছেন–আফার জ্বর দেইখ্যা আমরার মাথা গেল আউলাইয়া।

চট করে মাথা আউলানো ভাল না। বড় ডাক্তার নুহাশের চিকিৎসা করছেন। মাঝখান থেকে অন্য একজন এসে কি-না-কি অষুধ দিয়েছে–

অষুধ ভাল দিছে আম্মা। খাওনের পরে পরে জ্বর কমতির দিকে।

আমার সামনে থেকে যাও তো মুনার-মা। মুখে মুখে কথা বলবে না। নুহাশের বাবা আসে নি?

জ্বে-না।

কোন খবর পাঠায় নি?

জে না।

রেবেকার মুখ পাথরের মত হয়ে গেল। গলার স্বর হল হিমশীতল। নুহাশের মনে হল আজ রাতে বাবা-মার মধ্যে ভয়ংকর একটা ঝগড়া হবে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঝগড়াটা আজ তাদের বাসায় হবে। অবশ্যি বাবা কিছুই বলবেন না, চুপ করে শুনবেন, মাঝে মাঝে দুএকটা হাসির কথা বলে মাকে হাসাবার চেষ্টা করবেন। বাবার জন্যে নুহাশের খুব খারাপ লাগতে শুরু করল।

.

মিনহাজ উদ্দিন এক হাতে দুটা আনারস ঝুলিয়ে রাত সাড়ে এগারোটায় শিস দিতে দিতে বাড়ি ফিরল। রেবেকা যে কাপড় পরে বাইরে গিয়েছিল সেই কাপড় এখনো বদলায় নি। হাত-মুখ ধোয়নি। চোখ-মুখ কঠিন করে সে। স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করছে। কলিং বেল বাজতেই সে নিজেই উঠে দরজা খুলল। মিনহাজ আনন্দিত গলায় বলল, ওরে বাপরে, আজ দেখি তোমাকে পরীর মত লাগছে। সবুজ শাড়িটা তো আগে কখনো দেখি নি। খুব সুন্দর।

রেবেকা কিছু বলল না। মিনহাজ আনারস দুটি রাখতে রাখতে বলল, আসল জলডুবি। মধুর চেয়ে এগারো গুণ বেশি মিষ্টি। এই আনারস খাবার পর রসগোল্লা খেলে পানসে লাগবে।

রেবেকা বলল, তোমার সঙ্গে কথা আছে। বস এখানে।

মিনহাজ হাসিমুখে বলল, কথা বলার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে ঝগড়া করবে। দূরবর্তী বিপদ সংকেত পাচ্ছি।

রসিকতা করবে না। আমার সামনে বস, আমি কি বলছি মন দিয়ে শোন।

যা বলার দয়া করে আধঘণ্টা পর বল। আধঘণ্টা পরে বললে কি হবে জান? এখন বাজে সাড়ে এগারোটা। আধঘণ্টা পর বারোটা বাজবে নতুন দিন শুরু হবে। এবং আমি বলতে পারব যে একটা পুরো দিন আমরা ঝগড়া ছাড়া পার করেছি।

নুহাশকে আজ বিকেল পাঁচটায় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার কথা ছিল না?

হ্যাঁ, ছিল।

নিয়ে গিয়েছিলে?

মনে হয় নিয়ে যাই নি।

কেন?

বলতে চাচ্ছি না।

কেন বলতে চাচ্ছ না?

নুহাশকে ডাক্তারের কাছে না নিয়ে যাবার কারণ বলার সঙ্গে সঙ্গে তুমি খুব লজ্জা পাবে। এই জন্যে বলতে চাচ্ছি না।

কারণটা বল।

রেবেকা, না বললেই ভাল হয়। যদি বলি তাহলে তোমার খুব খারাপ লাগবে। এই ভেবে খারাপ লাগবে যে কেন সব না জেনেই রাগ করলাম। যাই হোক, জানতে চাচ্ছ যখন বলি– আমি বদরুলের মাকে দেখতে গিয়েছিলাম। তোমাকে তো আগেই বলা হয়েছে বদরুলের মা গত একমাস ধরে মরার চেষ্টা করছেন। পারছেন না। আজরাইল এর মধ্যে চার-পাঁচ বার এসেছে-মুখ বেজার করে ফিরে গেছে। আজরাইলের মত ক্ষমতাধর একজন ফেরেশতাকে যদি নব্বই বছরের একজন বৃদ্ধাকে নেবার জন্যে এতবার আসেত হয় তাহলে ...

তুমি আসল কথা বল। রসিকতা ভাল লাগছে না।

ও আচ্ছা। আসল কথা। আসল কথা হল–আমার যাবার কথা পাঁচটায়। আমি ঠিক সাড়ে চারটার সময় বললাম, বদরুল, দোস্ত আমি উঠি। মেয়েকে ডাক্তারের কাছে নিতে হবে।

বদরুল বলল, কোন্ ডাক্তার?

আমি বললাম, চাইল্ড স্পেশালিস্ট ডাক্তার রহমান। বদরুল বলল, টেলিফোন করে যা। নয়ত দু তিন ঘণ্টা বসে থাকতে হবে। ব্যাটার কাছে রোজ দু তিনশ রুগী যায়। আমি টেলিফোন করলাম। ডাক্তারের অ্যাসিসটেন্ট বলল, আজ ডাক্তার সাহেব আসবেন না। তাঁর

কি যেন জরুরী কাজ পড়েছে মেডিকেল এসোসিয়েশনে। কাজেই আমি নুহাশকে নিয়ে যাই নি। তারপরেও অবশ্যি দেরি করে আসার জন্যে তুমি আমার উপর রাগ করতে পার। এখন দয়া করে আমাকে ভাত দাও। খিদেয় প্রাণ যাচ্ছে।

রেবেকা উঠে চলে গেল। মিনহাজ ঢুকল নুহাশের ঘরে। পাঞ্জাবী খুলতে খুলতে বলল, নুহাশ, মা মণি, তুমি যে ঘুমের ভান করে পড়ে আছ তা আমি বুঝতে পারছি। দয়া করে চোখ মেলে তাকাও এবং ছোট্ট একটা হাসি দাও।

নুহাশ বাবার দিকে তাকিয়ে হাসল।

মিনহাজ গলার স্বর নিচু করে বলল, সমূহ বিপদ থেকে বাঁচার জন্যে তোমার মার কাছে মিথ্যে কথা বলেছি।

তুমি টেলিফোন কর নি বাবা?

টেলিফোন কোত্থেকে করব? আমি কি ঐ ব্যাটার টেলিফোন নাম্বার জানি নাকি? ডাক্তারের ব্যাপারটা পুরোপুরি ভুলে গিয়েছিলাম। এখন কেন জানি আমার আশংকা হচ্ছে মিথ্যাটা ধরা পড়ে যাবে। কাল যদি তোর মা ডাক্তারের কাছে যেতে চায় তাহলে সমস্যা হবে।

তুমি আমাকে নিয়ে যাও।

আমিই তো নিয়ে যাব। তোর মাকে কোন মতেই ডাক্তারের কাছে। যেতে দেয়া যাবে না।

.

মিনহাজ ভাত খেতে খেতে বলল, ডাক্তার সাহেবের কাছে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছি। কাল ছটার সময় আমি নুহাশকে নিয়ে যাব। এই ব্যাপারে তোমাকে আর চিন্তা করতে হবে না। আমার উপর ছেড়ে দাও।

রেবেকা বলল, আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই না। ঝগড়া করতে করতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ডাক্তার রহমানের সঙ্গে তুমি টেলিফোনে কোন কথা বল নি। আমি বলেছিলাম। নুহাশের কি হয়েছে জানার জন্যে টেলিফোন করেছিলাম। উনি বললেন, তুমি নুহাশকে নিয়ে যাও নি।

মিনহাজ অন্যদিকে তাকিয়ে কাঁচামরিচে কামড় দিল।

রেবেকা বলর, কোথায় গিয়েছিলে?

জোছনা দেখতে গিয়েছিলাম।

জোছনা দেখতে?

হু। বদরুল বলল, আজ পূর্ণিমা আছে- চল শালবনে গিয়ে পূর্ণিমা দেখে আসি। ও একটা জীপও জোগাড় করেছিল।

পূর্ণিমা দেখেছ?

হু।

ভাল লেগেছে?

হু।

খুব ভাল লাগল?

হ্যাঁ খুব ভাল লাগল। দেখার মত দৃশ্য। অরণ্যের সঙ্গে জোছনার খুব ভাল সম্পর্ক আছে। আমাদের উচিত পূর্ণিমার রাতগুলি বনে কাটানো। এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন–আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে।

রেবেকা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, পূর্ণিমা দেখতে তোমার আর অসুবিধা করব না। তুমি মনের সমস্ত মাধুরী মিশিয়ে পূর্ণিমা দেখতে পারবে। হাঁ করে সারারাত চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারবে। কারণ আমি তোমার সঙ্গে বাস করব না।

তার মানে?

তুমি থাকবে তোমার পূর্ণিমা নিয়ে, তোমার বন্ধুবান্ধব নিয়ে। আমি থাকব নুহাশকে নিয়ে।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

বুঝতে না-পারার তো কিছু নেই। আমি যা বলেছি সহজ বাংলায় বলেছি। রেবেকা উঠে চলে গেল। মিনহাজ মনের ভুলে কচ করে একটা আস্ত কাঁচামরিচ চাবিয়ে ফেলল।

২. নুহাশকে ডাক্তারের কাছে

রেবেকা নুহাশকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। কাপড় পরে তৈরি হচ্ছে। মিনহাজ বলল, আমি সঙ্গে যাই? রেবেকা বলল, না, তুমি না। তুমি তোমার বন্ধুদের কাছে যাও। ওদের সঙ্গে গল্প কর। পূর্ণিমার পরের রাতেও সুন্দর জোছনা হয়। যাও, শালবনে গিয়ে জোছনা দেখে আস। চেষ্টা করলে আজও নিশ্চই জীপটা জোগাড় করা যাবে।

মিনহাজ করুণ গলায় বলল, শুধু শুধু রাগ করছ।

আমি মোটেই রাগ করছি না। ঝগড়াও করছি না। অতীতে অসংখ্যবার ঝগড়া করেছি, কুৎসিত ঝগড়া করেছি। এখন ঠিক করেছি–আর না। তোমাকে আমি আর কখনও বিরক্ত করব না। আমি চাই না তুমিও আমাকে বিরক্ত কর।

আচ্ছা, আমি আর বিরক্ত করব না। আমি কি করলে তুমি বিরক্ত হও তার একটা লিস্ট করে বসার ঘরে টানিয়ে রাখ। এখন থেকে আমি লিস্ট মেনে চলব।

সস্তা রসিকতা আমার সঙ্গে করবে না। এ ধরনের সস্তা রসিকতা আগে অনেকবার করেছ। এগুলি পুরানো হয়ে গেছে।

ও আচ্ছা। নতুন কিছু কি বলব?

নতুন কিছু বলতে হবে না। বরং আমি তোমাকে নতুন কিছু বলি অফিস থেকে আমাকে একটা কোয়ার্টার দেবে। আমি নুহাশকে নিয়ে ঐ কোয়ার্টারে চলে যাব।

আমি সেখানে যেতে পারব না?

না।

কবে দিচ্ছে কোয়ার্টার?

খুব শিগগিরই দেবে। অল্প কিছুদিন আমি এই বাড়িতে আছি। সেই অল্প কিছুদিন তুমি যদি এ বাড়িতে না থাক তাহলে খুব ভাল হয়।

বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছ?

রেবেকা জবাব দিল না। নুহাশের কান্না পেতে লাগল। মা, বাবার সঙ্গে এরকম ঝগড়া করছে কেন? কই, বাবা তো ঝগড়া করছে না। বাবা জোছনা দেখতে গিয়েছে তো কি হয়েছে? জোছনা দেখতে ভাল লাগে, তাই দেখতে গিয়েছে। মাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে নুহাশের ভাল লাগে না। মা কেমন গম্ভীর হয়ে থাকে। বাবাকে নিয়ে যাবার মধ্যে অনেক রকম মজা আছে। রিকশা দিয়ে যাবার সময় যদি দেখা যায়–একজন আমড়াওয়ালা যাচ্ছে, তখন নুহাশকে কিছু বলতে হবে না। বাবা নিজেই বলবে–আমার খুব আমড়া খেতে ইচ্ছা করছে রে নুহাশ। কি করা যায় বল তো? আমড়া কিনব?

খেতে ইচ্ছা করলে কিনে ফেল।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

দুজন দুটা আমড়া কিনে খেতে খেতে যাই। কি বলিস?

আচ্ছা।

দুটা আমড়া কেনা হত। বাবা আমড়ায় কামড় দিয়েই বলতেন–

বরিশালের আমড়া
বসে বসে কামড়া।

বেলুনওয়ালাকে রাস্তায় দেখা গেলে বাবা অতি অবশ্যি রিকশা থামিয়ে বলবে–দেখি আমাদের দুজনকে দুটা বেলুন দাও তো। অনেক দিন আমি বেলুন নিয়ে খেলি না। খেলতে ইচ্ছা করছে।

কত রকম মজা যে বাবা করে। রিকশায় যাবার সময়ও মাঝে মাঝে তাকে ঘাড়ে বসিয়ে রাখে। হাসতে হাসতে বলে, লোকজন কি রকম অবাক হয়ে তাকাচ্ছে দেখ রে নুহাশ–সবাই ভাবছে এই মেয়েটি এত লম্বা হল কি করে?

আমার ভয় করছে বাবা।

বেশি ভয় করছে?

হু।

আমি কি শিখিয়ে দিয়েছি? ভয় পেলে কি করতে হয়?

একটা গান গাইতে হয়।

তাহলে সেই গানটা গলা ছেড়ে গেয়ে ফেল।

আমার লজ্জা করছে বাবা।

লজ্জা করার কিছু নেই। আচ্ছা, আমিও গাচ্ছি। আমার সঙ্গে গাইলে আর লজ্জা করবে না।

দুজন এক সঙ্গে গাইতে থাকল–

দূর কর দূর কর
দূর কর ভয়।
দূর কর হে
দূর কর হে...

মার সঙ্গে বেরুলে এরকম কোন মজা নেই। চটপটি খেতে ইচ্ছা করলে–মাকে বললে লাভ হবে না। মা বলবে, এসব খেতে হয় না মা। চটপটি ভর্তি থাকে জীবাণুতে। কিলবিল করতে থাকে জীবাণু। নোংরা কুৎসিত সব জীবাণু।

ঝালমুড়ি খেতে ইচ্ছা করলে মা বলবে-তাকিয়ে দেখ ঝালমুড়িওয়ালার হাতগুলি কি ময়লা। সে তার ময়লা হাতে মুড়ি মেখে দেবে। ঐ মুড়ি খেলেই অসুখ হবে।

তারপরেও অবশ্যি মার সঙ্গে বেড়াতে যাবার অন্য রকম মজা আছে। মা এক হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে রাখে। কি যে ভাল লাগে। এত আনন্দ হয়।

.

ডাক্তার সাহেব বললেন, তারপর খুকী, তোমার কি নাম?

নুহাশ।

বাহ্ কি সুন্দর নাম! দেখি খুকী, জিভটা বের কর তো।

নুহাশ জিভ বের করল। ডাক্তার সাহেব বললেন, নুহাশ নামের মানে কি খুকী?

কি অদ্ভুত ডাক্তার, জিভ বের করিয় প্রশ্ন করছে, নুহাশ নামের মানে কি? জিভ বের করে রেখে কেউ কি কথা বলতে পারে? ডাক্তার সাহেব নিজে পারবেন?

কি খুকী, নামের অর্থ বলতে পারছ না কেন?

নুহাশ জিভ ভেতরে ঢুকিয়ে বলল, নুহাশ শব্দের অর্থ হল–কম দামী ধাতু।

কম দামী মানে?

লোহা, পিতল এইসব ...

ডাক্তার সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, ধাতুর নাম যদি রাখতেই হয় তাহলে রাখা উচিত দামী দামী ধাতুর নামে। যেমন প্লাটিনাম, সোনা, রূপা ... খুকী জিভ ভেতরে ঢুকিয়েছে কেন? জিভ বের কর। কে রেখেছে এই নাম?

নুহাশ বলল, আমার বাবা রেখেছেন।

আহা, আবার জিভ ভেতরে ঢুকালে। বাচ্চাদের নিয়ে এই যন্ত্রণা। কথা শুনতে চায় না।

ডাক্তার সাহেব নানান ধরনের পরীক্ষা করলেন। অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন–হাঁটুতে ব্যথা হয় কি-না। গভীর রাতে খিদে পায় কি-না। চোখ দিয়ে পানি পড়ে কি-না। ঠোঁট শুকিয়ে যায় কি-না। শেষমেশ বললেন, আমি তো তেমন কিছু পাচ্ছি না।

রেবেকা বলল, হঠাৎ হঠাৎ জ্বর আসে। আকাশ-পাতাল জ্বর।

ডাক্তার বললেন, আকাশ-পাতাল জ্বর আবার কি?

অনেক বেশি জ্বর। একশ চার। একশ পাঁচ।

আমি কিছু টেস্টের কথা লিখে দিয়েছি। থরো চেক আপ হোক। কোন একটা ভাল জায়গা থেকে টেস্টগুলি করাবেন। ব্যাঙের ছাতার মত ল্যাবোরেটরি গজিয়েছে। এজনের টেস্টের সঙ্গে আরেকজনের টেস্টের মিল নেই। আমাদের চিকিৎসা করতে হচ্ছে অনুমানে। আপনি টেস্টগুলি করিয়ে দিন পনেরো পরে আসুন। ও কি, খুকী তুমি এখনো জিভ বের করে আছ কেন?

নুহাশ বলল, আপনি তো জিভ ভেতরে ঢুকাতে বলেন নি।

ডাক্তার সাহেব হো হো করে হেসে ফেললেন। নুহাশ মনে মনে বলল, আজ সারাদিনে একজনকে মাত্র হাসাতে পেরেছি। কোন রকমে আরো দুজনকে যদি হাসানো যেত তাহলে চমৎকার হত।

রাস্তায় নেমে রেবেকা বললেন, কিছু কিনতে ইচ্ছে করছে নুহাশ?

না।

ইচ্ছা করলে বল। চকলেট? চকলেট খেতে ইচ্ছা করছে?

হু।

রেবেকা তিন শ টাকা দিয়ে এক টিন কেডবেরিজ চকলেট কিনল। আজ সে বেতন পেয়েছে। বেশ কিছু টাকা ব্যাগে। নুহাশের জন্যে কখনো তেমন কিছু কেনা হয় না। অসুস্থ মেয়ে...

রিকশায় উঠে রেবেকা বলল, টিনটা খুলে একটা মুখে দাও মা।

নুহাশ বলল, বাবাকে নিয়ে খুলব।

বাবাকে কি তোমার বেশি ভাল লাগে মা?

নুহাশ চুপ করে রইল। বাবাকে তার আসলেই অনেক বেশি ভাল লাগে। কিন্তু মাকে এই কথা বললে মা মন খারাপ করবে।

নুহাশ, কথা বলছ না কেন? বাবাকে কি তোমার বেশি ভাল লাগে?

না।

আমাকে বেশি ভাল লাগে?

না।

তাহলে কি দাঁড়াল? কাউকেই ভাল লাগে না?

দুজনকে সমান সমান ভাল লাগে।

দেখ মা, তুমি এখন কথা বলছ ডিপ্লোমেটের মত। ডিপ্লোমেট কি জান তো? ডিপ্লোমেট হচ্ছে রাজনীতিবিদ। এরা কি করে? এরা সবাইকে খুশি করতে চায়। তোমার যা বয়স তাতে সবাইকে খুশি দরকার নেই। তুমি যদি তোমার বাবাকে বেশি ভালবাস তাহলে সেটা বলবে। সত্যি কথা বলার অপরাধে তো তোমাকে আমি শাস্তি দেব না।

আমি তোমাকেই বেশি ভালবাসি মা।

তোমার বাবাকেও নিশ্চয়ই তুমি একই কথা বর। তাকেও নিশ্চয়ই তুমি বল-তোমাকেই আমি সবচে বেশি ভালবাসি বাবা।

না, বলি না। তুমি সব সময় জানতে চাও কাকে বেশি ভালবাসি। বাবা কখনো জানতে চায় না।

জানতে চাইলে বলতে?

হু।

তাহলে কি মিথ্যা কথা বলা হল না? একই সঙ্গে কি দুজনকেই বেশি ভালবাসা যায়?

যায়।

রেবেকা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, শোন নুহাশ, আজ রাতে তোমাকে কিছু জরুরী কথা বলা হবে। তুমি চকলেট খেতে খেতে খুব মন দিয়ে কথাগুলি শুনবে।

আচ্ছা।

তোমার হয়ত শুনতে ভাল লাগবে না। তবু শোনা দরকার।

আচ্ছা।

দেখি জ্বর আছে কি-না।

রেবেকা জ্বর দেখল। তার মুখ বিষণ্ণ হয়ে গেল। সে নিচু গলায় বলর, হুঁ, আবার জ্বর আসছে মনে হচ্ছে। কি হচ্ছে এসব? দুদিন পরপর জ্বর!

রেবেকা বাড়ি ফিরে দেখল বাড়িতে হুলস্থূল হচ্ছে। মিনহাজ রান্না করছে। মুনার-মা শুকনো মুখে একটু দূরে দাঁড়িয়ে। ঘরময় থালাবাটি ছড়ানো। খাবার টেবিলের উপর একটা বঁটি। সবজি কাটা হচ্ছে টেবিলে।

মিনহাজ হাসিমুখে বলল, রান্না করছি। রান্নাবান্না করে তোমার মন ভুলানোর চেষ্টা। কি রান্না হচ্ছে জান? হাঙ্গেরিয়ান গোলাস। অপূর্ব! একবার খেলে কোরমা পোলাও মুখে রুচবে না। কোরমা পোলাও মুখে দিয়ে থু করে ফেলে দেবে!

রেবেকা কিছু না বলে শোবার ঘরে ঢুকল। নহাশকে শুইয়ে দিল বিছানায়। নুহাশ বলল, মা আমি বাবার রান্না দেখব।

না তোমাকে বাবার রান্না দেখতে হবে না।

আমার দেখতে ইচ্ছে করছে মা।

অন্য আরেকদিন দেখবে।

রেবেকা শোবার ঘরের বিছানায় বসে আছে। তার মাথা ধরেছে। মিনহাজের ছেলেমানুষি হৈচৈ অসহ্য বোধ হচ্ছে। এরচে সে বন্ধুর বাড়িতে থাকলেই ভাল হত।

মুনার-মা এসে বলল, বাড়িওয়ালা আসছে। আপনের সঙ্গে কথা বলতে চায়।

রেবেকা বিরক্ত স্বরে বলল, আমার সঙ্গে কি কথা? নুহাশের বাবা ঘরে আছে। তার সঙ্গে কথা বলত বল।

বলছিলাম। উনি আপনের সাথে কথা বলতে চায়।

বসতে বল। আমি যাচ্ছি।

বাড়িওয়ালা সিদ্দিক সাহেব অন্য বাড়িওয়ালাদের মত না। তিনি বেশ দ্র। কথাবার্তায় অমায়িক। নতুন মাস শুরু হওয়া মাত্র ভাড়ার জন্যে তাগিদের পর তাগিদ পাঠানোর অভ্যাসও তাঁর নেই।

রেবেকা বলল, কেমন আছেন?

সিদ্দিক সাহেব বললেন, ভাল আছি।

কি ব্যাপার বলুন তো?

সিদ্দিক সাহেব বিব্রত গলায় বললেন, না, তেমন কোন ব্যাপার না। অকারণেই এসেছি বলতে পারেন।

অকারণে তো আসেন নি। নিশ্চয়ই কোন কারণে এসেছেন। বলুন...

বাড়িভাড়া নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম।

বাড়িভাড়া বাড়াতে চান?

আরে না, বাড়িভাড়া বাড়াব কেন? বছর বছর বাড়িভাড়া বাড়ানোর অভ্যেস আমার নেই। দুবছর তো আছেন আমার এখানে। দুবছরে বাড়িভাড়া বাড়িয়েছি?

না।

আমি এসেছি কারণ অনেক দিন বাড়িভাড়া দেয়া হয় না...

রেবেকা বিস্মিত হয়ে বলল, অনেক দিন বাড়িভাড়া দেয়া হয় না মানে? কত দিন দেয়া হচ্ছে না?

এই মাস নিয়ে পাঁচ মাসের ভাড়া বাকি পড়ল।

সে কি?

সিদ্দিক সাহেব বললেন, টাকাপয়সার সমস্যা সময় সময় হতেই পারে। হওয়াটাই স্বাভাবিক। না হওয়াটাই বরং বিচিত্র। তবু একসঙ্গে অনেক জমে গেলে...

আমি আগামীকালই আপনার বাড়িভাড়া মিটিয়ে দেব। এটা নিয়ে চিন্তা করবেন না।

না না, আমি চিন্তা করি না। আজ তাহলে উঠি।

সিদ্দিক সাহেব উঠে গেলেন। রেবেকা চোখে পানি এসে গেল। এ কি কাণ্ড! বাড়িভাড়া মিনহাজের দেয়ার কথা। রেবেকা সংসার চালানোর যাবতীয় খরচ দেয়। মিনহাজের শুধু বাড়িভাড়া, গ্যাস এবং ইলেকট্রিসিটির বিল দেবার কথা। সে যখন পাঁচ মাস বাড়িভাড়া দেয় নি। গ্যাস, ইলেকট্রিসিটির বিলও নিশ্চয়ই দেয় নি।

রেবেকা রান্নাঘরে ঢুকল। মিনহাজ কড়াইয়ে তেল চাপিয়েছে। সে খুব ব্যস্ত। পাঞ্জাবীর হাতা গুটিয়ে নিয়েছে। গুনগুন করে গানও গাওয়া হচ্ছে।

আজি এ বসন্তে
কত ফুট ফুটে
কত পাখি গায়...

রেবেকা শীতল গলায় বলল, গান বন্ধ কর। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

মিনহাজ হাসিমুখে বলল, তুমি কি বলবে তা আমি জানি। সিদ্দিক সাহেব এসেছিলেন সেই খবর পেয়েছি। পাঁচ মাস বাড়িভাড়া দেয়া হয়নি এই তো? এটা কোন বড় ব্যাপার না।

তোমার ধারণা খুবই তুচ্ছ ব্যাপার?

ইয়েস মাই ডিয়ার ইয়াং লেডি। আমার তাই ধারণা। আমি যখন পুরো ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করব তখন তোমারও তাই ধারণা হবে। তুমি বসার ঘরে বস। আমি রান্না শেষ করেই আসছি। দশ মিনিটের বেশি লাগবে না।

রেবেকা বসার ঘরে এসে চুপচাপ বসে রইল। মিনহাজ ঘরে ঢুকল আধ ঘণ্টা পর। মিনহাজের হাতে দুকাপ চা।

চা বানিয়ে আনলাম। চা খেতে খেতে আমার ব্যাখ্যা শোন। মুখ এমন গম্ভীর করে রাখার দরকার নেই। তুমি এমন ভাব করছ যেন নিকট আত্মীয় কেউ মারা গেছে। কেউ মারা যায় নি। সবাই ভাল আছে।

তুমি কি বলতে চাচ্ছ তাই বল।

ব্যাপার হল কি-বদরুলের মা অসুস্থ হয়ে পড়ল। বুড়ো বয়সে অসুখ বিসুখ হলে সিরিয়াস অবস্থা হয়। জোয়ানদের যেখানে একটা অষুধে কাজ হয় বুড়োদের সেখানে লাগে দশটা অষুধ। চিকিৎসার খরচ চালাতে গিয়ে বদরুলের অবস্থা হয়ে গেল কেরাসিন। কেরাসিনের চেয়েও খারাপ। বদরুলের অবস্থা হলে গেল পেট্রোল। আমি তাকে গত পাঁচ মাসের বাড়িভাড়ার টাকা দিয়ে সাহায্য করেছি।

জনসেবা?

জনসেবা না। জনসেবা করার ক্ষমতা আমার কোথায়? বন্ধুসেবা বলতে পার।

বাড়িভাড়া তুমি দিচ্ছ না এটা আমাকে জানাতে অসুবিধা ছিল?

ছিল। তুমি রাগ করতে। আমি তোমাকে রাগাতে চাচ্ছিলাম না। তবে তুমি কোন রকম চিন্তা করবে না। প্রভিডেন্ট ফান্ডের লোনের জন্যে দরখাস্ত করেছি। লোন গ্রান্টেড হয়েছে। চা খাচ্ছ না কেন, চা খাও।

রেবেকা চায়ের কাপ হাতে নিল না। শীতল গলায় বলল, নিজের সংসারের প্রতি, নিজের স্ত্রী এবং সন্তানের প্রতি তুমি কোন রকম দায়িত্ব অনুভব কর না। তাই না?

আরে কি যে বল, দায়িত্ব অনুভব অবশ্যই করি।

না, কর না। সামান্যতম দায়িত্বও যদি থাকত তাহলে আমরা বাড়ি ফেরা মাত্র তুমি জিজ্ঞেস করতে, ডাক্তার নুহাশ সম্পর্কে কি বলল। জিজ্ঞেস করেছ?

জিজ্ঞেস করি নি কারণ তোমাদের মুখ দেখেই মনে হয়েছে, ডাক্তার বলেছেন–সব ঠিকঠাক আছে। ডাক্তার কোন অষুধপত্রও দেন নি। অষুধপত্র দিলে সঙ্গে থাকতো। সঙ্গে কিছুই নেই। শুধু নুহাশের হাতে এক টিন চকলেট।

রেবেকা স্বাভাবিক গলায় বলল, নুহাশের জন্মের সময়ের কথা মনে আছে?

কোন কথা বল তো?

নুহাশের জন্মের এক সপ্তাহ আগে তুমি যে দেশ ভ্রমণে বের হয়ে গেলে।

ও আচ্ছা। বাংলাদেশের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় হেঁটে যাওয়া টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া।

হ্যাঁ টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া। তুমি জানতে যে কোন দিন নুহাশের জন্ম হতে পারে। তা জেনেও আমাকে একা ফেলে তুমি তোমার সেই বিখ্যাত টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া ভ্রমণ শুরু করলে। কেন করলে?

এরও একটা ব্যাখ্যা আছে। সুন্দর ব্যাখ্যা। শুনলেই তোমার মনে হবে ঠিক ঐ সময়ে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া ভ্রমণ ছিল খুবই প্রয়োজনীয়।

ব্যাখ্যাটা শুনবে?

না। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে এগারো বছর। এই এগারো বছর শুধু ব্যাখ্যাই শুনেছি। আর শুনতে ইচ্ছা করছে না। আমি খুব খুশি হব তুমি যদি এই বাসা ছেড়ে এখন চলে যাও। তোমাকে আগেও একবার বলেছি, আজও বলছি, আমি তোমার সঙ্গে বাস করতে পারব না।

এখন চলে যেতে বলছ?

হ্যাঁ এখনই চলে যেতে বলছি। যাবার সময় তোমার হাঙ্গেরিয়ান গোলাস নিয়ে যেও। এই বস্তু আমি খাব না। আমি আমার মেয়েকেও খেতে দেব না।

লঘু পাপে গুরু দণ্ড হয়ে যাচ্ছে না?

না। তোমাকে আমি শাস্তি দিচ্ছি না। তোমাকে আমি যা দিচ্ছি তা হচ্ছে মুক্তি।

রেবেকা উঠে দাঁড়াল। মুনার-মাকে বলল–খাবার যা রান্না হয়েছে একটা টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে নিয়ে আস। পুরোটা টিফিন ক্যারিয়ারে ঢুকাবে। এতটুকুও যেন না থাকে।

রেবেকা মিনহাজের সামনে টিফিন ক্যারিয়ার রেখে সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল, এই নাও তোমারা খাবার। এখন যেখানে যেতে ইচ্ছে, যাও।

সত্যি সত্যি যেতে বলছ?

হ্যাঁ বলছি। তোমাকে দেখলেই আমার মেজাজ খারাপ হবে। ঝগড়া করব। এসব আর ভাল লাগছে না। তুমিও শান্তিতে থাক। আমাকেও শান্তিতে থাকতে দাও। দয়া করে এখন উঠ।

মিনহাজ উঠল। ক্লান্ত গলায় বলল, আচ্ছা যাচ্ছি। টিফিন ক্যারিয়ারটা থাকুক। খাবারটা ভাল হয়েছে। আমি মানুষ খারাপ কিন্তু ভাল রাঁধুনি।

টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে যাও।

আচ্ছা নিচ্ছি। মুখ এমন কঠিন করে রেখ না রেবেকা। যাবার সময় তোমার হাসিমুখে দেখে যাই। এই পৃথিবীতে হাসিমুখ দেখা দুর্লভ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর কথা বাড়িও না। রাত হচ্ছে–রওনা হয়ে যাও।

নুহাশকে দেখে যাই।

ও ঘুমুচ্ছে। ওর ঘুম ভাঙানোর কোন প্রয়োজন দেখছি না।

আচ্ছা।

মিনহাজ টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে বের হয়ে গেল।

রাতে নুহাসশকে ঘুম থেকে তোলা হল রাতের খাবার খাওয়ার জন্যে।

নুহাশ বলল, বাবা কোথায় মা?

রেবেকা বলল, বাইরে গেছে।

নুহাশ বলল, বদরুল চাচার বাসায়?

হতে পারে, আমি জানি না।

নুহাশের প্রিয় খাবারের একটি হচ্ছে ডিম ভাজা। প্রিয় খাবারই তাকে দেয়া হয়েছে। নুহাশ বলল, বাবা যে রান্না করেছে সেটা একটু খাব মা।

ঐ খাবার ছোটদের জন্যে না।

তবু একটু খাব। অল্প একটু।

ঐ খাবার তোমার বাবা নিয়ে গেছেন।

নুহাশ বিস্মিত হয়ে তাকাচ্ছে। ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। রেবেকা বলল, তোমাকে বলেছিলাম না, আজ রাতে খুব জরুরী কিছু কথা তোমাকে বলব।

হ্যাঁ বলেছিলে।

ভাত খেতে খেতে আমার কথাগুলি মন দিয়ে শোন। তোমার বাবা একজন ভাল মানুষ। শুধু ভাল মানুষ বললে কম বলা হয়। খুবই ভাল মানুষ। হাসি খুশি, পরোপকারী।

পরোপকারী কি মা?

পরোপকারী হচ্ছে যে অন্যের উপকার করে বেড়ায়। ঐ যে দেখ– তোমার বদরুল চাচার মার অসুখ হল। খবর পেয়ে সব কাজকর্ম ফেলে তোমার বাবা পড়ে রইল সেখানে। একে বলে পরোপকার। যে কথা বলছিলাম, তোমার বাবা একজন ভাল মানুষ। সবাই তাকে পছন্দ করে। তুমিও কর। কর না?

হ্যাঁ করি।

সবার কাছেই তোমার বাবা প্রিয়। আমার কাছেও এক সময় খুব প্রিয় ছিল।

এখন না?

না, এখন না। শুধু এখন না, অনেক দিন থেকেই প্রিয় না। তোমার সামনেই তো আমরা ঝগড়া করি। করি না?

বাবা তো ঝগড়া করে না।

তা ঠিক তোমার বাবা ঝগড়া করে না। সে হাসিমুখে আমার সামনে বসে থাকে। যখন আমি খুব কঠিন কথা বলি, সে হো হো করে হাসে। হো হো করে হাসার মানে হচ্ছে তোমার কথায় আমি কান দিচ্ছি না। তুমি যা ইচ্ছা বল। কিছুই যায় আসে না। এই করে সে আমাকে আরো রাগিয়ে দেয়। কাজেই হাসিমুখে সামনে বসে থেকেও সে কিন্তু আসলে ঝগড়া করছে। ঠিক বলছি না মা?

হ্যাঁ ঠিক বলছ।

দিন রাত ঝগড়া করতে করতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আর ঝগড়া করতে, রাগারাগি করতে ভাল লাগছে না। আমি ঠিক করেছি আমি এমন কিছু করব যাতে আর ঝগড়া না হয়। এটা ভাল না মা?

হ্যাঁ ভাল। খুব ভাল।

কি করলে আর কখনো আমাদের ঝগড়া হবে না বল তো নুহাশ?

আমি জানি না।

দুজন যদি আলাদা থাকি। মাঝে মাঝে তোমার বাবা আসবে। হৈচৈ, গল্পগুজব করবে। তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে। তারপর আবার চলে যাবে নিজের জায়গায়।

বাবা কোথা থাকবে?

সেটা তোমার বাবা ঠিক করবে। তার যেখানে থাকতে ভাল লাগে সে সেখানেই থাকবে। বন্ধুর বাসায় থাকবে, কিংবা হোটেলে থাকবে। আবার একটা বাসা ভাড়া করেও থাকতে পারে।

বাবাকে কে বেঁধে দেবে?

রান্নার জন্যে সে কোন একটা লোক রাখবে। কিংবা নিজেই রাঁধবে। আজ সে নিজে রাঁধল না?

নুহাশ করুণ চোখে তাকিয়ে আছে। কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। রেবেকা বলল, তোমার বাবা এবং আমি আমরা দুজন যদি আলাদা থাকি তাহলে সবার জন্যেই ভাল হয়। তোমার বাবার জন্যে ভাল হয়, কারণ তাহলে সে নিজের মত করে থাকতে পারে। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিতে পারে, ঘুরে বেড়াতে পারে, জোছনা দেখার জন্যে বনে জঙ্গলে থাকতে পারে। আমার জন্যে ভাল হয় কারণ আমিও তাহলে নিজের মত করে থাকতে পারি। আমাকে ঝগড়া করতে হয় না। তোমার বাবাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হয় না। তোমার জন্যেও ভাল হয়, কারণ তোমাকে তাহলে কোন ঝগড়া শুনতে হয় না। ঝগড়া শুনতে কি তোমার ভাল লাগে মা?

না।

কাজেই দেখ, তোমার জন্যেও ভাল হল। তোমাকে আর ঝগড়া শুনতে হবে না। এখন যাও হাত ধুয়ে দাঁত মেজে শুয়ে পড়। আমার বিছানায় শোও। এখন থেকে আমরা দুজন এক বিছানায় শোব।

হাত ধুতে ধুতে নুহাশ বলল, আমার একা ঘুমুতেই ভাল লাগে মা।

আমার সঙ্গে ঘুমুতে চাও না?

না।

তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ নুহাশ?

না, আমি রাগ করি নি।

আমার তো মনে হয় করেছ।

না করি নি।

.

নুহাশের ঘুম আসছে না। কিন্তু ঘুমের ভান করে সে শুয়ে আছে। ঘরের কাজকর্ম সেরে অনেক রাতে মুনার-মা নুহাশের ঘরে ঘুমুতে এল। এই ঘরেই সে পাটি পেতে ঘুমোয়। নুহাশ মুনার-মাকে দেখে বিছানায় উঠে বসে নিচু গলায় বলল, বুয়া, আমার বাবা-মা কি ভাল মানুষ, না মন্দ মানুষ?

মুনার-মা হাই তুলতে তুলতে বলল, আল্লাহ পাকের দুনিয়ায় সব মানুষই ভাল। আবার সবই মন্দ। মানুষ বড় বিচিত্র গো আফা।

নুহাশের আরো কিছু কথা জিজ্ঞেস করার ছিল কিন্তু মুনার-মা ঘুমিয়ে পড়েছে।

একবার ঘুমিয়ে পড়লে তাকে জাগানো খুব মুশকিল।

৩. নুহাশ স্কুলে

নুহাশ স্কুলে যাবার জন্যে তৈরি হয়েছে। মুনারা-মা তাকে স্কুলে নিয়ে যাবে। নুহাশের কাঁধে বইয়ের ব্যাগ, হাতে পানির বোতল। মুনার-মাকে সে কিছু নিতে দেবে না। রিকশায় যাবার সময় মুনার-মা তাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে থাকে। তাতেও নুহাশের আপত্তি, সে বড় হয়েছে তাকে হাত ধরে ধরে রাখা যাবে না। তাছাড়া বুয়ার গা থেকে মশলার গন্ধ আসছে।

স্কুলের কাছাকাছি এসে নুহাশ বলল, স্কুলে যেতে ইচ্ছা করছে না বুয়া।

বাসায় চইল্যা যাবা?

হু।

আম্মায় হুনলে রাগ হইব।

অনেকদিন স্কুলে কামাই হয়েছে। আজও যদি না যাওয়া হয় তাহলে মা সত্যি সত্যি রাগ করবে। নুহাশের সঙ্গে রাগ করলে মা হৈচৈ বা বকাঝকা করে না–কথা বন্ধ করে দেয়, আর কেমন ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকে। এরচে বকাঝকা ছিল ভাল।

নুহাশ বলল, আমার বোধ হয় জ্বর আসছে। জ্বর নিয়ে কি স্কুলে যাওয়া উচিত?

না, উচিত না। দেখি জ্বর কেমন?

মুনার-মা গায়ে হাত দিল। গা ঠাণ্ডা। জ্বর নেই।

জ্বর আছে না বুয়া?

উঁহু, শইল ঠাণ্ডা।

শরীর ঠাণ্ডা হওয়াও এক ধরনের জ্বর। আসল জ্বরের চেয়েও খারাপ।

তা হইলে চল বাসায় যাই গিয়া।

বাসায় যেতেও ইচ্ছা করছে না।

মুনার-মা বিস্মিত হয়ে বলল, কই যাইতে চাও?

বাবার কলেজে চল না বুয়া। তুমি তো চেন। চেন না? মিনহাজের কলেজ মুনার-মা চেনে। কয়েকবার এসেছে। কিন্তু হুট করে নুহাশকে নিয়ে কলেজে উপস্থিত হওয়াটা কি ঠিক হবে? আম্মা শুনলে প্রচণ্ড রাগবে। নুহাশ বলল, চল না বুয়া।

রিকশা ভাড়া তো নাই। যামু ক্যামনে?

আমার কাছে টাকা আছে। আমি স্কুল ব্যাগে হরলিক্সের কৌটাটা নিয়ে এসেছি।

মিনহাজকে কলেজে পাওয়া গেল না। আজ তার ক্লাস ছিল এগারোটায়, কিন্তু সে দশদিনের আনড লিভ নিয়েছে। আগামী দশদিন আসার কোন সম্ভাবনা নেই। কলেজের একজন স্যার বললেন, তোমার বাবাকে কিছু বলতে হবে খুকী?

নুহাশ কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, না।

বাসায় চলে যাও। নিশ্চয়ই তোমার বাবা এতক্ষণে বাসায় চলে গেছে।

আচ্ছা।

নুহাশ বাসায় গেল না। কলেজের করিডোরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তার কেন জানি মনে হচ্ছে-বাবা হুট করে কলেজে চলে এসে তাকে চমকে দেবে। এ রকম কতবার হয়েছে। আসার যখন কথা না, তখন বাবা এসে উপস্থিত। একবার তারা নানাবাড়ি গিয়েছে–জামালপুর। দুপুরের ট্রেনে গেছে। বাবা যায় নি। তার নাকি খুব জরুরি কাজ। সকালে কলেজে পরীক্ষার ডিউটি আছে। প্রিন্সিপ্যাল ছুটি দেবে না। এত মন খারাপ হল নুহাশের! ট্রেনে উঠল কাঁদতে কাঁদতে। মা বলল, বাবা সঙ্গে যাচ্ছে না তো কি হয়েছে। তার কাজ আছে। কাজেই সে যাচ্ছে না। বেড়ানোর চেয়ে কাজ বড় না?

নুহাশের নানা বাড়ি পৌঁছল সন্ধ্যাবেলা। বাড়িতে ঢুকে দেখে বাবা নানীজানের পালংকে পা তুলে হাসিমুখে সবার সঙ্গে গল্প করছে। নুহাশের দিকে তাকিয়ে বলল, তারপর তোমাদের কি খবর? নুহাশ এতই অবাক হল যে মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। তার মনে হল এটা বোধ হয় স্বপ্ন। রেবেকা বলল ব্যাপার কি? মিনহাজ হাসতে হাসতে বলল, তোমাদের একটা

সারপ্রাইজ দিলাম। পরীক্ষার ডিউটি অন্য একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে সোজা চলে গেলাম বাস স্টেশনে। বাস করে এক ধাক্কায় জামালপুর। কি, সারপ্রাইজড হয়েছ?

নুহাশের ধারণা, বেশ কিছুক্ষণ কলেজের করিডোরে দাঁড়িয়ে থাকলে সারপ্রাইজ দেয়ার জন্যে বাবা এসে উপস্থিত হবে।

মুনার-মা বলল, চল যাই গিয়া। কতক্ষণ খাড়াইয়া থাকবা?

আচ্ছা চল।

নুহাশের মনে হল সে অনেকদিন বাবাকে দেখছে না, অনেক অনেক দিন। আজ দেখা হলে খুব ভাল হত। অনুস্বার কবিতাটা শোনা যেত। বাবা নুহাশকে নিয়ে একটা কবিতা বানিয়েছে। কবিতার নাম অনুস্বার কবিতা। খুব জটিল কবিতা। এমিতে মানে বোঝা যায় না। কিন্তু মানে আছে।

নুহাশ আব্বুটিং

(নুহাশ আব্বু)

গোলটা চক্ষুং
(তার চোখ গোল)
হাসটুং করছিং
(সে হাসি করছে অর্থাৎ হাসছে)

ফিকফিকিং
(ফিকফিক করে)
হাসটুং দেখং, আদর লাগছিং
(হাসি দেখে আদর লাগছে)

নুহাশ জ্বর নিয়ে ফিরল। এতে সে এবং মুনার-মা দুজনই বেশ খুশি হল। মাকে আর মিথ্যা বলতে হবে না। সত্যি সত্যি জ্বর এসেছে।

জ্বর হওয়া নুহাশের অভ্যাস হয়ে গেছে। খারাপ লাগে না বরং চাদর গায়ে দিয়ে জানালার কাছে বসে থাকতে ভাল লাগে। মুনার-মা বলল, কিছু খাইবেন আফা?

না।

সরবত বানাইয়া দেই, লেবু দিয়া?

উঁহু।

জ্বর তাইলে কমব।

সরবত খেলে জ্বর কমবে না। জ্বর কেন হয় তা কি তুমি জান মুনার মা?

জানব না ক্যান? আল্লাহ্ পাক জ্বর দেয় বইল্যাই জ্বর হয়।

দূর। আল্লাহ্ এমন খারাপ জিনিস আমাদের দেবেন কেন? উনি দেবেন। ভাল ভাল জিনিস।

জ্বর খারাপ জিনিস না আফা। জ্বর ভাল জিনিস। জ্বর হইলে পাপ কাটা যায়।

কি যে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা তুমি বল বুয়া।

পুব দিকের জানালা খোলা। জ্বর গায়ে নুহাশ জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে। দুটি ভিখিরী মেয়ে ঠিক জানালার নিচে খেলা করছে। অদ্ভুত খেলা। একজন অন্যজনকে ঠেলছে এবং খিলখিল করে হাসছে। এই খেলার নাম বোধ হয় ঠেলাঠেলি খেলা। নুহাশ ডাকল-অ্যাই অ্যাই। ওরা দুজনও একই সঙ্গে বলল–অ্যাই অ্যাই। বলে হেসে একজন অন্যজনের গায়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। এত আনন্দ এদের!

দুপুরে এল শিল-পাটা ধার করানোর মানুষটা। নুহাশের তখন জ্বর বেড়েছে। সে শুয়ে আছে চাদর গায়ে জড়িয়ে। এখন তার কিছুই ভাল লাগছে না। দেয়ালগুলিকে মনে হচ্ছে অনেক বেশি শাদা। চোখে লাগছে। শিল-পাটা ধার করানোর লোকটা ঠিক তার জানালার কাছে এসে মিষ্টি করে বলছে–শিল-পাটা ধার করাইবেন? শিল-পাটা। অবিকল যেন একটা গান। গান শুনতে শুনতে নুহাশ ঘুমিয়ে পড়ল। যখন ঘুম ভাঙল তখন বিকেল। নুহাশের গায়ে জ্বর নেই। শরীর ঝরঝরে। খুব খিদে হয়েছে। ঘুম ভেঙেই সে শুনল মা কার সঙ্গে যেন উঁচু গলায় কথা বলছেন। কার সঙ্গে? বাবা কি চলে এসেছে? নুহাশ কান পেতে রাখল। না–বাবা আসে নি। মেজোমামা।

নুহাশের একজনই মামা। তিনি নুহাশের মার চেয়ে বয়সে দশ বছরের বড়। তবু নুহাশ কেন তাকে মেজোমামা ডাকে সে নিজেও জানে না।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

তার নাম জাহেদুল করিম। বিমানের পাইলট। বেশির ভাগ সময় দেশের বাইরে থাকেন। খুব গম্ভীর ধরনের মানুষ। তবু কেন জানি নুহাশের তাকে খুব ভাল লাগে। তিনি এ বাড়িতে আসার মানেই হল–কোন-না-কোন উপহার নুহাশের জন্যে নিয়ে এসেছেন। তিনি খালি হাতে এ বাড়িতে এসেছেন এমন দুর্ঘটনা এখন পর্যন্ত ঘটে নি।

মেজোমামার সঙ্গে মা ঝগড়া করছে কেন? বড় ভাইদের সঙ্গে কখনো কি ঝগড়া করা যায়? যায় না। নুহাশের কোন বড় ভাই থাকলে সে কখনো তার সঙ্গে ঝগড়া করত না। বড়দের ঝগড়া ছোটদের শোনা উচিত না–তবু নুহাশ শুনছে। কারণ মা কেন ঝগড়া করছে তা জানতে ইচ্ছে করছে।

মেজোমামা : (গলা খুব গম্ভীর) তুই বলতে চাচ্ছিস যে তোদের অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে না? [অ্যাডজাস্টমেন্ট ব্যাপারটা কি নুহাশ বুঝতে পারছে না। এক সময় মাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

মা : না অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে না। অতীতেও হয় নি, ভবিষ্যতেও হবে না। আমরা দুজন দুই মেরুর মানুষ। [মেরুর মানুষ আবার কি? এস্কিমো?]

মেজোমামা : তুই তবে চাস কি?

মা : আমি ঠিক করেছি ওর সঙ্গে বাস করব না।

মেজোমামা : বাস করব না বলতে কি মিন করছিস? [মিন করছিসটা আবার কি?]

মা : আমি সেপারেশন নেব ভাইয়া। আমি নুহাশকে নিজের মত করে মানুষ করব।

মেজোমামা : সেপারেশন নিবি?

মা : হ্যাঁ নেব। সেপারেশন ছাড়া পথ নেই। [সেপারেশন কি নুহাশ জানে। তাদের ক্লাসের একটি মেয়ে মিথিলার বাবা-মার সেপারেশন হয়েছে। বাবাটা অন্য একটা মেয়েকে বিয়ে করেছে। সেই মেয়েটা একদিন স্কুলে এসেছিল। ও আল্লা দেখতে কি যে কুৎসিত!]।

মেজোমামা : চট করে বলে ফেললি সেপারেশন?

মা : চট করে তো বলি নি ভাইয়া। আমি এটা নিয়ে তিন বছর চিন্তা করেছি। তোমাদের কাউকে কিছু বলি নি। ওর সঙ্গে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব।

মেজোমামা : আমার তো ধারণা তুই এখনি পাগল হয়ে গেছিস... কথা শোন রেবেকা! ব্যাপারটা হল কি...

মা : তুমি আমাকে কিছু বুঝাতে এসো না ভাইয়া। লাভ হবে না। আমি আজ অফিসে যাই নি। এক লইয়ারের কাছে গিয়েছি। ওকে উকিলের চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি।

মেজোমামা: কি বললি?

মা : বুঝতে পারছি–তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না। উকিলের চিঠির কপি আমার কাছে আছে। দেখতে চাইলে দেখতে পার।

মেজোমামা: আই সি।

মা : ভাইয়া চা খাবে?

মেজোমামা : না, চা খাব না। নুহাশকে দেখে চলে যাব। তোর অবগতির জন্যে জানাচ্ছি- নুহাশের বাবাকে আমি অসম্ভব পছন্দ করি।

মা : সেটা আমি জানি। ওর চরিত্রে কিছু মজার ব্যাপার আছে যা সবাইকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু তোমরা ওর সঙ্গে জীবনযাপন কর না। আমি করি। আমার কাছে কিছুই মজার বলে মনে হয় না। তুমি কি চলে যাচ্ছ ভাইয়া?

মেজোমামা: হ্যাঁ চলে যাচ্ছি।

.

মেজোমামা চলে যাবার আগে নুহাশের ঘরে ঢুকলেন। নুহাশ লাফ দিয়ে উঠল।

কেমন আছিস রে নুহাশ টুনটুন?

ভাল আছি মেজোমামা।

জ্বর বাঁধিয়েছিস শুনলাম।

হ্যাঁ মামা বাঁধিয়েছি।

জ্বর বেশিদিন বেঁধে রাখিস না। বেশিদিন বেঁধে রাখলে গায়ের সঙ্গে লেগে যাবে, আর ছাড়ানো যাবে না।

এবার তুমি আমার জন্যে কোন উপহার আন নি মামা?

এনেছি।

কি এনেছ?

আলাদিনের আশ্চর্য চেরাগ।

সত্যি মামা?

হ্যাঁ সত্যি। ঐ প্যাকেটে আছে।

নুহাশ হতভম্ব গলায় বলল, ঘষলে দৈত্য চলে আসে?

দূর পাগলী। দৈত্য আসবে কোত্থেকে? এটা একটা খেলনা। আলাদিনের প্রদীপের মত করে বানিয়েছে। ভেতরে দুটা পেনসিল ব্যাটারী আছে। ঘষলে প্রদীপের মাথা থেকে কুচকুচে কালো ধোঁয়া বের হয়। মোটর সাইকেলের মত কিছুক্ষণ ভটভট শব্দ হয়। লাল নীল আলো বের হয়। হংকং থেকে কিনলাম।

নুহাশ দুঃখিত গলায় বলল, সত্যিকার প্রদীপ কিনলে না কেন মামা?

সূচিপত্র

পাগলী কি বলে, সত্যিকার প্রদীপ পাব কোথায়? পাওয়া গেলে তো ভালই হত। এই সময়ে যে জিনিসটার সবচে বেশি দরকার তা হল আলাদিনের আশ্চর্য চেরাগ। যাই পাগলী।

নুহাশের মেজোমামা দুঃখী দুঃখী মুখে চলে গেলেন। মামাকে এত দুঃখিত হতে নুহাশ এর আগে কখনো দেখে নি। নুহাশের এতই মন খারাপ হল যে সে উপহারের প্যাকেটটা পর্যন্ত খুলল না।

৪. ছুটির শেষ দিন

রেবেকা অফিস থেকে দুদিনের ছুটি নিয়েছিল। আজ ছুটির শেষ দিন। সে নুহাশকে স্কুলে দিয়ে বাসায় ফিরে চা খেতে বসেছে তখনি কলিং বেল বাজল। দরজা খুলল রেবেকা নিজেই। মিনহাজ দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে রজনীগন্ধার কয়েকটা স্টিক। কিন্তু মিনহাজের মুখও শুকনো।

রেবেকা কঠিন গলায় বলল, কি ব্যাপার?

কোন ব্যাপার না। কেমন আছ?

ভালই আছি, খারাপ থাকব কেন? উকিল নোটিস পেয়েছ? তোমার বন্ধু বদরুলের ঠিকানায় পাঠিয়েছিলাম।

পেয়েছি।

কখন পেলে?

গত রাতে। আমি একটু দিনাজপুর গিয়েছিলাম কান্তজীর মন্দির দেখতে। ফিরে এসে দেখি এই ব্যাপার। একটু বসি রেবেকা।

রেবেকা মনে মনে হাসল। মিনহাজ আজ তার নিজের ঘরেই বসার অনুমতি চাইছে। রেবেকা বলল, ফুলগুলি কি আমার জন্যে?

হু।

অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছ?

মিনহাজ হাসল। রেবেকা বলল, দয়া করে হাসবে না। তোমার হাসি আমার অসহ্য বোধ হয়। উকিল নোটিস সম্পর্কেও আমাকে কিছু বলতে চেষ্টা করবে না বা বোঝাতে চাইবে না। আমি যা করেছি অনেক ভেবেচিন্তেই করেছি। যাতে সবার মঙ্গল হয় সেই ব্যবস্থাই করেছি।

মিনহাজ করুণ গলায় বলল, তোমাকে এবং নুহাশকে ছাড়া আমার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব না।

ভুল বলছ। আমরা দুজন তোমার কাছে কোন ব্যাপারই না। তুমি ব্যস্ত তোমার নিজের ভুবন নিয়ে। তোমার নিজের ভুবন খুব ইন্টারেস্টিং। সেই তুলনায় আমরা মোটেও ইন্টারেস্টিং নই। আমাদের কোন কিছুতেই তোমার কিছু যায় আসে না।

ভুল বললে রেবেকা।

ভুল বলি নি। আমি এক্ষুণি প্রমাণ করে দিতে পারি। প্রমাণ করব?

কর।

বেশ, তাহলে বল তো আমি কোথায় কাজ করি? কোন্ অফিসে? অফিসটা কোথায়? অফিসে আমার নিজের একটা টেলিফোন আছে। সেই টেলিফোনের নাম্বার কত?

মিনহাজ কিছু বলছে না। বিব্রত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। রেবেকা হাসতে হাসতে বলল, আমি গত চার বছর ধরে চাকরি করছি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি এই চার বছরে তুমি জানতে চাও নি–আমার চাকরিটা কি? জানার আগ্রহ হয় নি ..

মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি ...।

ব্যাপার-ট্যাপার কিছু না। এটা হল তোমার প্রকৃতি। তোমার প্রকৃতির এই অংশ সবার অজানা। সবাই তোমার প্রকৃতির উজ্জ্বল দিকটা জানে। যাই হোক, চা বানিয়ে দিচ্ছি। চা খাও। চা খেয়ে চলে যাও।

নুহাশ কখন ফিরবে?

স্কুল শেষ হলেই ফিরবে। ভাল কথা, নুহাশ কোন স্কুলে পড়ে বল তো?

অগ্রণী।

আগে অগ্রণীতে পড়তো। তারপর স্কুল বদল করা হয়েছে। এখন সে পড়ে হলি ক্রসে। স্কুল বদলের সেই খবর তুমি জান না। ভাল কথা, ওর জন্ম তারিখ জান? বল তো কত?

দশই জুলাই।

রেবেকা হাসতে হাসতে বলল, হয় নি। হবে না জানতাম। দশই জুলাই আমার জন্মদিন। নুহাশের নয়। চা দুধ দিয়ে দেব, না দুধ ছাড়া?

চা খাব না।

তাহলে তো ভালই। এখন চলে যাও।

বিকেলে একবার আসি? নুহাশের সঙ্গে দেখা হয় নি।

বিকেলে এলে দেখা হবে না। আমি ওকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাব। তোমার আসার দরকার কি? মায়া যা আছে তাই থাকুক, বাড়িয়ে লাভ নেই। আরেকটা কথা, আমি এই বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি।

যাচ্ছ কোথায়?

একটা অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে উঠব। ভাড়া একটু বেশি, কিন্তু সিকিউরিটি ভাল।

অ্যাপার্টসেন্টটা কোথায়? ঠিকানা কি?

রেবেকা হাই তুলতে তুলতে বলল, একদিনে অনেক কথা বলে ফেলেছি। আর কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানা দিতে চাও না?

এই মুহূর্তে চাচ্ছি না। আমি এখন একটু শুয়ে থাকব।

চলে যেতে বলছ?

হ্যাঁ, ফুলগুলি দয়া করে নিয়ে যাও। বাসি ফুল দিয়ে ঘর ভর্তি করতে চাই না।

মিনহাজ উঠে দাঁড়াল। তার মুখ বিষণ্ণ। দরজা দিয়ে বেরুতে গিয়ে সে চৌকাঠে ধাক্কা খেল। সে তাকাল রেবেকার দিকে। রেবেকা বলল, তোমার মন এখন যত খারাপ বলে মনে হচ্ছে তত খারাপ থাকবে না। মুক্তির আনন্দ পাবে। এক কাজ কর-কুয়াকাটা বলে একটা জায়গায় তোমার যাবার খুব শখ ছিল–ঐখানে চলে যাও। সমুদ্রে সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয় দুটাই দেখবে। ইন্টারেস্টিং হবে।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। মিনহাজ বৃষ্টিতেই নেমে গেল। এগুতে লাগল ভিজতে ভিজতে। রেবেকার একটু খারাপ লাগছে। এই খারাপ লাগাকে প্রশ্রয় দেয়া ঠিক না। শেকসপিয়ারের একটা কথা আছে। হ্যামলেট বলছিল– I have to be cruel, only to be kind. রেবেকা তাই করছে। এর বেশি কিছু না।

.

দুদিন পর মিনহাজ আবার এল।

এবার তার হাতে কুড়িটা টাটকা গোলাপ। এক বাক্স চকলেট, এবং একটা বার্বি ডল। কলিং বেল টিপতে গিয়ে দেখল-দরজায় বিরাট তালা ঝুলছে। জানালা-টানালা সব বন্ধ। তবু অভ্যাস বসে তিন-চার বার কলিং বেল টিপল। কোন শব্দ হল না।

মিনহাজ গেল বাড়িওয়ালা সিদ্দিক সাহেবের কাছে। সিদ্দিক সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, ওরা যে চলে গেছে আপনি জানেন না?

জ্বি-না।

সে কি! দুদিন ধরে মাল নেয় হচ্ছে। আজ সকালে বিছানা বালিশ নেয় হল। বাড়ি ছাড়ার সময় আপনার মেয়েটা খুব কাঁদছিল। এমন কান্না! দেখে আমার নিজের চোখেও পানি এসে গেল।

মিনহাজ কি বলবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। সিদ্দিক সাহেব বললেন বাড়ি যে ছেড়ে দেবে সেটা তো জানতেন?

মিনহাজ ইতস্তত করে বলল– জ্বি জানতাম।

কোথায় গেছে সেই ঠিকানা আছে না?

জ্বি আছে।

সেখানে চলে যান। আমিও একবার যাব। ঠিকানা জানি না অবশ্যি। আপনি বলুন, ঠিকানাটা লিখে নেই। আপনার মেয়েটার জন্য মন কাঁদছে– একদিন গিয়ে দেখে আসব।

মিনহাজ বলল, জায়গাটা চিনি-মালিবাগের দিকে। ঠিক অ্যাডড্রেস জানি না। জেনে এসে আপনাকে লিখে দিয়ে যাব।

সিদ্দিক সাহেবের বাড়ি থেকে বের হয়ে মিনহাজ দীর্ঘ সময় পার্কে একা একা বসে রইল। দুপুরে চকলেটের টিন মাথায় নিচে দিয়ে পার্কের বেঞ্চিতে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখল-নুহাশকে নিয়ে সে পার্কে বেড়াতে এসেছে। নুহাশ তার কাঁধে। একদল বাচ্চাকাচ্চা তাদের ঘিরে আছে। সে অনুস্বার কবিতা পড়ছে। বাচ্চারা খুব মজা পেয়ে হাততালি দিচ্ছে, এবং মুখে বিচিত্র শব্দ করছে। যেমন :

মিনহাজ : নুহাশ আবাবুটিং
বাচ্চারা : টিং টিং টিং
মিনহাজ : গোলটা চক্ষুং
বাচ্চারা : উং উং উং।
মিনহাজ : খুব হাসটুং
বাচ্চারা : টুং টুং টুং
মিনহাজ : ফিকফিকিং
বাচ্চারা : ইং ইং ইং

৫. অ্যাপার্টমেন্টটা খুব সুন্দর

অ্যাপার্টমেন্টটা খুব সুন্দর না নুহাশ?

হ্যাঁ সুন্দর!

তাহলে এমন মন খারাপ করে আছ কেন? নতুন অ্যাপর্টমেন্টে আসার পর একবারও হাসলে না। দেখি সোনা হাস তো?

নুহাশ হাসল।

তোমার ঘরটা কত সুন্দর তাকিয়ে দেখ। জানালা খুললে কত বাতাস। তার চেয়েও বড় কথা-জানালা খুললে পুরো আকাশটা দেখা যায়। আকাশ দেখতে পাচ্ছ?

পাচ্ছি।

আকাশটা সুন্দর না?

হ্যাঁ সুন্দর।

দেখ কত বড় বড় দুটা ক্লসেট তোমার ঘরে। একটাতে থাকবে তোমার খেলনা। একটায় বইপত্র। পড়ার টেবিলটা থাকবে জানালার পাশে। পড়তে পড়তে যদি আকাশ দেখতে ইচ্ছা করে তাহলে শুধু মুখ তুলে তাকালেই হবে।

নুহাশ হাই তুলল। তার কিছু ভাল লাগছে না।

আবার এই দেখ, ঘরের সঙ্গে বাথরুম। এই বাড়িটার সবচে ভাল জিনিস কি বল তো নুহাশ?

জানি না।

সবচেয়ে ভাল জিনিসটা হচ্ছে বাথরুম। দেখ, ঘরের সঙ্গে লাগোয়া কি সুন্দর বাথরুম। সুন্দর না?

নুহাশ মায়ের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, মা, বাবা কি এই বাড়ির ঠিকানা জানে?

রেবেকা চট করে জবাব দিতে পারল না। ইতস্তত করে বলল, দেখা হলে আমি তাকে ঠিকানা দিয়ে দেব। তখন জানবে।

কবে দেখা হবে?

হবে, শিগগিরই হবে। এসো তো নুহাশ, আমরা তোমার বাথরুমটা দেখি। এখানে গরম পানির ব্যবস্থা আছে।

আমার বাথরুম দেখতে ইচ্ছা করছে না।

রাতে কিছু রান্না হয় নি। রেবেকা প্যাকেটে করে চাইনীজ খাবার নিয়ে এসেছে। মুনার-মা মুখ বিকৃত করে সেই খাবারই টেবিলে সজিয়ে দিচ্ছে। বিড়বিড় করে বলছে, মানুষ এই জিনিস ক্যামনে খায়বদ গন্ধ আসতাছে। ওয়াক থু।

নুহাশ খাবার টেবিলে বসে হঠাৎ করে বলল, মা আমার ভাল লাগছে না।

রেবেকা বলল, কি ভাল লাগছে না?

বাবা থাকবে এক জায়গায়, তুমি থাকবে আরেক জায়গায়, এটা আমার ভাল লাগছে না মা।

সব কিছু তোমার ভাল লাগামত করতে হবে তা তো না। তাছাড়া কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ তাও তুমি জান না। ভাল-মন্দ বোঝার বয়স তোমার হয় নি। ওকি, খাচ্ছ না কেন?

আমার খেতে ইচ্ছা করছে না।

খেতে ইচ্ছা না করলে হাত ধুয়ে উঠে যাও। খাবার নাড়াচাড়া করবে না।

নুহাশ টেবিল ছেড়ে উঠে গেল। নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। রেবেকা দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, এ কি নুহাশ, দরজা বন্ধ করছ কেন? নুহাশ জবাব দিল না। রেবেকা বলল, একা তুমি ঘুমুতে পারবে না। রাতে ভয় পাবে। মুনার-মা ঘুমুবে তোমার সঙ্গে।

নুহাশ জবাব না দিয়ে বাতি নিভিয়ে দিল।

তুমি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছ নুহাশ। খুব বাড়াবাড়ি করছ। একটু পরেই আমিও দরজা বন্ধ করে ঘুমুতে যাব। তখন ভয় পাবে।

নুহাশ জবাব দিল না।

রেবেকা বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে গেল।

৬. চারিদিক অন্ধকার

চারিদিক অন্ধকার।

নুহাশের ভয় ভয় লাগছে। ভূতের সব কটা গল্প একমঙ্গে মনে পড়ছে। মনে হচ্ছে খাটের নিচে ঘাপটি মেরে একটা কন্ধকাটা ভূত বসে আছে। পৃথিবীতে যত ভূত আছে-কন্ধকাটা হল তার মধ্যে সবচে ভয়ঙ্কর। এর মাথা নেই। শরীরটা বিশাল কিন্তু হাত দুটি সেই তুলনায় খুব সরু, প্রায় সুতার মত। কথা বলে ফিসফিস করে।

দেয়ালে টকটক শব্দ হচ্ছে। কে করছে? তাকালেও কিছু দেখা যাবে না, কারণ অন্ধকার। জমাট অন্ধকার। খাটের নিচে খচমচ শব্দ হচ্ছে কেন? নুহাশ চাপা গলায় বলল, কে? কে?

কেউ জবাব দিল না। খচমচ শব্দটাও এখন হচ্ছে না। নুহাশ বাতি জ্বালাল। তার ঘুম আসছে না। বিছানায় শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে না। গল্পের বই পড়া যায়। কিন্তু মা সবগুলি গল্পের বই প্যাকেট করে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছেন। প্যাকেট এখনো ভোলা হয় নি।

খেলনাগুলি নিয়ে কিছুক্ষণ কি খেলবে? একা একা খেলতেও ইচ্ছা করছে না। এই এক আশ্চার্য ব্যাপার, কখনো একা খেলা যায় না। খেলার জন্যে সব সময় একজন কাউকে দরকার। বড়রাও খেলতে পারে। যেমন বাবা। বাবার সঙ্গে নুহাশ অনেক ধরনের খেলা খেলে। সবচে বেশি খেলে রান্নাবাটি। পৃথিবীতে যত খেলা আছে তার মধ্যে রান্নাবাটি খেলা হল সবচে ভাল খেলা। মিছিমিছি রান্না করতে হয়। মিছিমিছি রান্না খেয়ে মিছিমিছি বলতে হয়–রান্না খুব ভাল হয়েছে। এইসব কথা বলতে হয় সত্যের মত করে। বলার সময় হাসা

যাবে না। বাবা খুব ভাল মিছিমিছি কথা বলেন। মনে হয় সত্যি কথা বলছেন। ঐদিন সে বাবার সঙ্গে রান্নাবাটি খেলা খেলল। নুহাশ বলল, ওগো তরকারীটা কেমন হয়েছে দেখ তো।

বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন, ভাল হয়েছে। লবণ একটু কম হয়েছে। রঙটা এমন হলুদ হলুদ হল কেন? তরকারীতে রঙ না হলে আমি খেয়ে আরাম পাই না। হলুদ বেশি দিয়েছ না-কি? মরিচ বেশি দেয়া দরকার ছিল। তাহলে রঙ হত।

মরিচ ইচ্ছা করে কম দিয়েছি। মরিচ বেশি হলে বাচ্চারা খেতে পারে না।

ওদের জন্যে আলাদা রান্না করলেই পার।

আমি একা মানুষ। এক হাতে কদিক সামলাব?

কেন, কাজের ছেলেটা তো আছে।

ও কি কিছু জানে না-কি! হাত ধরে ধরে কাজ শেখাতে হচ্ছে। ঐদিন সেটের একটা কাপ ভেঙে ফেলল।

সে কি?

ভেঙেও আবার মিথ্যা কথা বলে। আমাকে বলে, আম্মা, আমি হাত দিয়া ছুঁইয়াও দেহি নাই।

কানে ধরে বার করে দাও। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

তুমি তো বলেই খালাস। কানে ধরে বের করে দিলে আরেকটা পাব কোথায়? তোমার নিজের জন্যেই তো একজন ফুল টাইম কাজের লোক দরকার। দিনের মধ্যে দশবার সিগারেট আনাচ্ছ। আচ্ছা, তোমার সিগারেট যা লাগে এক সঙ্গে আনিয়ে রাখতে পার না? যতবার সিগারেট ধরাবে ততবার এক কাপ করে চা লাগবে। এত কিছু করলে আমি সংসার দেখব কিভাবে? আমার তো চারটা হাত না। দুটা মোটে হাত।...

নুহাশের চোখে প্রায় পানি এসে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে বাবার সঙ্গে আর কোনদিনও রান্নাবাটি খেলা যাবে না। কোনদিন না। কত দিন যে সে বাবাকে দেখে না। বাবার বিখ্যাত অনুস্বার কবিতা শুনে না। কি যে সুন্দর ঐ কবিতাটা।

নুহাশের চোখে এবার সত্যি সত্যি পানি এল। সে চোখ মুছে মেজোমামার দেয়া খেলনার প্যাকেট খুলতে বসল। এই প্যাকেটটা এখনো খোলা হয় নি। প্যাকেটে কি আছে সে জানে। আলাদিনের আশ্চার্য চেরাগ। তবে খেলনা চেরাগ। সত্যিকারের চেরাগ থাকলে তো ভাল হত। সে দৈত্যটাকে বলতো–তুমি এক্ষুণি বাবা-মাকে একসঙ্গে করে দাও। এক্ষুণি। এক্ষুণি। এক্ষুণি।

আলাদিনের চেরাটা বেশ ভারী। দেখে মনে হয় লোহার তৈরি। জায়গায় জায়গায় পাথর বসানো। ধরবার হাতলও আছে। নুহাশ বাত হাতে হাতল ধরে, ডান হাতে প্রদীপের একটা পাশ ঘষল। ওমি প্রদীপের মুখ দিয়ে প্রথমে সাদা ধোঁয়া, তারপর কালো ধোঁয়া বের হতে লাগল। শব্দ হতে লাগল কটকট, কটকট। নুহাশ যদি না জানত এটা একটা খেলনা প্রদীপ

তাহলে অবশ্যই ভয়ে চিৎকার করে উঠত। সত্যিকার প্রদীপের ভেতর থেকে নিশ্চয়ই এরকমই কালো ধোঁয়া বের হয়।

ও আল্লা, ধোঁয়া তো বেরুচ্ছেই। আরো ঘন হয়ে বেরুচ্ছে। মনে হচ্ছে। ধোয়াটা জমাট বাঁধছে। জমাটবাঁধা ধোঁয়া দিয়ে মানুষের মত কি যেন তৈরি হচ্ছে। নুহাশ হাত থেকে খট করে প্রদীপ ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়া বের হওয়া বন্ধ হল। তবে ধোয়া জমাট বেঁধে মানুষের মত হয়ে গেল। মানুষের মত না, অবিকল মানুষ। শার্ট প্যান্ট পরা। চোখে চশমা, পকেটে একটা বল পয়েন্ট কলম। রোগা পটকা ধরনের একটা মানুষ। ধবধবে সাদা গায়ের রঙ। কিন্তু চুলের রঙ সোনালী। লোকটা বিরক্ত হয়ে বলল, খট করে প্রদীপটা যে ফেলে দিলে, এর মানে কি? ব্যথা লাগে না বুঝি?

নুহাশ আতঙ্কে অস্থির হয়ে বলল, তুমি কে?

লোকটা আরো বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি তুমি করছ কেন? আপনি করে বল।

আপনি কে?

আমি কে তা তো বুঝতেই পারছ। তুমি তো কচি খুকী না। আমি হলাম আলাদিনের চেরাগের দৈত্য।

নুহাশ অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আপনাকে দৈত্যের মত লাগছে না।

চেহারা দিয়ে দৈত্য বোঝা যায়? দৈত্যের পরিচয় হল ক্ষমতায়। বল তোমার কি চাই। দেরি করবে না। ঝটপট বল। ঝটপট!

যা চাই তাই দিতে পারবেন?

বোকার মত কথা ভুলবে না। যা চাইবে তাই কি করে দেব? আকাশের চাঁদ চাইলে কি এনে দিতে পারব? চাঁদের ওজন কত জান? পাঁচ দশমিক সাত গুণন টেন টু দি পাওয়ার আঠারো কিলোগ্রাম।

আপনি কি সত্যি সত্যি আলাদিনের দৈত্য?

অবশ্যই। চেরাগের ভেতর ধোয়া হয়ে শুয়ে থাকি। কেউ ঘষলে বের হয়ে আসি। খুকী, তোমার কাছে চিরুনি আছে? চুলটা আঁচড়ে নেয়া দরকার। এলোমেলো হয়ে আছে।

নুহাশ চিরুনি বের করে দিল। দৈত্য চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল, চট করে বল তোমার কি দরকার। এনে দিচ্ছি। আজগুবি কিছু চেয়ে বসবে না। কৎবেল খেতে চাও? কৎবেল খেতে চাইলে কোন গাছ থেকে একটা পেড়ে নিয়ে আসব। তবে বৃষ্টি হলে পারব না। বৃষ্টি হয়ে গাছ পিছল হয়ে থাকে। গাছে উঠতে পানি না।

আপনি যে সত্যি সত্যি দৈত্য এটা বিশ্বাস হচ্ছে না।

চোখের সামনে দেখলে ধোঁয়া থেকে তৈরি হয়েছি। তারপরেও বিশ্বাস হচ্ছে না? এই হচ্ছে মানবজাতির সমস্যা। এরা কিছুই বিশ্বাস করে না।

দৈত্য বিছানায় বসে, পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল।

নুহাশ বলল, এটা তো খেলনা প্রদীপ। এর ভেতর দৈত্য আসবে কিভাবে?

না জেনে কথা বলবে না তো খুকী। আলাদিনের প্রদীপের মত দেখতে যত প্রদীপ বানানো হয় সবগুলির ভেতর দৈত্য থাকে। এই হচ্ছে নিয়ম! তবে যে-কেউ ঘষলে দৈত্য বের হবে না। মন্দ মানুষের হাতে প্রদীপ কাজ করে না। ভাল মানুষ হতে হবে। বুঝতে পারছ?

না বুঝে নুহাশ মাথা নাড়ল। দৈত্যটা মনে হচ্ছে খুব রাগী। তাকে রাগাতে ইচ্ছা করছে না।

ও খুকী, তোমার কাছে সিগারেট আছে? সিগারেট খেতে ইচ্ছা করছে।

আমার কাছে নেই। আব্বর কাছে আছে। সিগারেট খেলে তো ক্যানসার হয়।

পান আছে? জর্দা দিয়ে একটা পান দাও তো।

পানও নেই।

দৈত্যটা ফুস করে নিঃশ্বাস ফেলল। বিরক্ত মুখে বলল, খুকী তাড়াতাড়ি বল তোমার কি চাই। তোমার কাজটা করে দিয়ে তারপর ঘুমুতে যাব। আরেকটা কথা, প্রদীপটা তুমি খোলামেলা জায়গায় রাখবে। ফ্যানের কাছে রাখলে খুব ভাল হয়। বাক্সের ভেতর রাখবে না, বাক্সের ভেতর রাখলে গরমে আমার ঘুমের অসুবিধা হয়। এখন চট করে বল কি চাই।

আমার বাবাকে এনে দিন।

তোমার বাবাকে এনে দেব মানে? উনি কোথায়?

মার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে তো। দুজন আলাদা থাকেন।

মানুষগুলিকে নিয়ে কি যে যন্ত্রণা! শুধু ঝগড়া করে। তোমার বাবা থাকে কোথায়?

জানি না। তবে বদরুল চাচার বাসায় থাকতে পারে।

বদরুল চাচার বাসা কোথায়?

জানি না।

না জানলে খুঁজে বের করব কিভাবে?

আপনি দৈত্য। আপনার কত ক্ষমতা।

ক্ষমতা আছে ঠিকই। তাই বেল দশ লক্ষ লোকের ভেতর একজনকে খুঁজে বের করা মুশকিল। তার উপর সব মানুষ দেখতে এক রকম। দুটা চোখ, দুটা কান, দুটা কান ... শুধু স্বভাব ভিন্ন। সাধু স্বভাব, চোর স্বভাব, কেজো স্বভাব ...।

আপনি বাবাকে খুঁজে বের করতে পারবেন না?

অবশ্যই পারব। না পারার তো কিছু নেই। দৈত্যরা অসাধ্য সাধন করতে পারে, তবে সময় লাগবে। অনেক অনেক সময় লাগবে। চট করে করা অসম্ভব।

কত সময় লাগবে?

দুই তিন মিনিট তো লাগবেই।

তাহলে আপনি এক্ষুণি নিয়ে আসুন। কিভাবে তাঁকে আনবেন? বাবা কিন্তু খুব ভারী। একশ ত্রিশ পাউন্ড ওজন।

তুমি কি ভাবছ আমি তাকে কোলে করে নিয়ে আসব? মানুষের বাচ্চাগুলি এরকম বোকা থাকে তা তো জানতান না। আমি তোমার বাবাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে আসব। সে এখানে চলে আসবে মনের ভুলে।

কখন আসবে?

বললাম তো দেরি হবে। এই সব জিনিস চট করে হয় না। অনেক সময় লাগে। দুমিনিটের আগে এই কাজ করা অসম্ভব। দুমিনিট ধৈর্য ধরতে হবে।

আচ্ছা আমি ধৈর্য ধরছি।

পানি খেয়ে নেই। দেখি এক গ্লাস পানি দাও তো। আবার বলে বসবে না পানি নেই।

ঠাণ্ডা পানি?

না ঠাণ্ডা পানি না। নরমাল পানি দাও। আমার টনসিলের প্রবলেম আছে। একবার একটা আইসক্রিম খেয়ে এক মাস ভুগেছি। দিন রাত কাশি– খক খক খক্।

দৈত্য পানি খেয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। তারপর যাই বলে অদৃশ্য হয়ে গেল। নুহাশের মনে হল পুরো ব্যাপারটাই স্বপ্ন। স্বপ্ন ছাড়া কিছুই না। তার উচিত বিছানায় শুয়ে পড়া। কিন্তু যদি সত্যি হয়? সত্যি হতেও পারে। নুহাশ চুপচাপ বসে রইল। আর কি আশ্চর্য, দুমিনিটের মাথায় কলিং বেল বাজতে লাগল। যেন কেউ খুব ব্যস্ত হয়ে কলিং বেল টিপছে।

রেবেকা বলল, কে কে?

নুহাশ তার বিছানায় বসে বসেই শুনল, মা তার ঘরের দরজা খুলে বের হয়ে এসেছেন। মুনার-মাও এসেছে।

রেবেকা বলল, পিপ হোল দিয়ে আগে দেখে নাও কে এসেছে। অপরিচিত কেউ হলে খুলবে না। মুনার-মা পিপ হোলে চোখ রাখল।

ও আম্মা, মনে হইতেছে খালুজান।

খালুজান মানে?

বসার ঘরের দরজা খোলা হল। নুহাশ আর কিছু শুনছে না। সে শক্ত হয়ে বসে আছে। এক সময় নুহাশ শুনল তার মা বলছেন–তুমি, তুমি কোত্থেকে? বাসার ঠিকানা পেলে কোথায়? কে তোমাকে ঠিকানা দিয়েছে?

মিনহাজের হকচকিত অবস্থা। কিছু বলতে পারছে না। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। তার কপালে ঘাম। নিঃশ্বাস পড়ছে ঘনঘন। রেবেকা বলল, কথা বলছ না কেন? বাড়ির ঠিকানা কোথায় পেলে?

আমি জানি না।

আমি জানি না? আবার রসিকতা? বাড়ি খুঁজে বের করলে কিভাবে?

মিনহাজ বিব্রত গলায় বলল, আমি নিজেই কিছু বুঝতে পারছি না। রফিকের বাসা খুঁজতে বের হয়েছিলাম। মালিবাগের এক ফ্ল্যাটবাড়িতে সে থাকে। আচ্ছা, এটা কি মালিবাগ?

না, এটা মালিবাগ না। এটা যে মালিবাগ না তা তুমি ভাল করেই জান।

বিশ্বাস কর আমি জানি না। রফিকের বাসাতেই আমি কলিং বেল টিপছিলাম। দরজায় লেখা ছিল-রফিকুল ইসলাম-৩১/বি মালিবাগ।

তোমার এ জাতীয় অদ্ভুত গল্প আগেও অনেক শুনেছি। আর শুনতে ভাল লাগছে না। রাত হয়ে গেছে–তুমি তোমার বন্ধুকে খুঁজে বের কর। আমরা ঘুমুতে যাব।

এটা মালিবাগ না?

না। এটা পুরানা পল্টন।

ব্যাপারটা কি করে ঘটল আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। বিশ্বাস কর আমি রিকশা থেকে নামলাম রেল ক্রসিং-এর কাছে। মালিবাগ রেল ক্রসিং

তোমার বানানো গল্প সারাজীবন ধরে শুনেছি–আর না ...

নুহাশ! নুহাশ কোথায়?

নুহাশ আছে নুহাশের ঘরে।

ওকে একটু দেখে যাই।

ও ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে ডাকা যাবে না।

চলে যেতে বলছ?

হ্যাঁ, বলছি।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে।

বৃষ্টি তো তোমার খুব পছন্দের জিনিস। বৃষ্টিতে সারাদিন ভেজার জন্যে-মনে নেই তুমি তোমার বন্ধুদের নিয়ে শালবনে গেলে। সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজে রাতে জ্বর নিয়ে ফিরলে।

আমি বরং সোফায় শুয়ে থাকি। আমার মাথা ঘুরছে। কোন একটা সমস্যা হয়েছে। আমি কি করে এখানে এলাম বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আজ রাতটা থেকেই যাই?

না। তোমার যন্ত্রণা সহ্য করতে আমি আর রাজি না।

দেখ রেবেকা, আমার গায়ের সব লোম এখনো খাড়া হয়ে আছে। এখনো বুঝতে পারছি না। ব্যাপারটা কি। সমস্যাটা কি।

বন্ধুর বাসায় যাও। বন্ধুর সঙ্গে সমস্যা নিয়ে আলাপ কর।

আচ্ছা, যাই তাহলে। এটা কোন জায়গা বললে?

পুরানা পল্টন।

ও আচ্ছ, পুরানা পল্টন। কি অদ্ভুত কাণ্ড! রেবেকা যাই।

হ্যাঁ যাও। গুড নাইট।

.

নুহাশের বিছানায় দৈত্য পা ঝুলিয়ে বসে আছে। তার মুখ বিষণ্ণ। দৈত্য বলল, খুকী তোমার কি যেন নাম বললে?

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

নুহাশ।

হু, নুহাশ। মনে থাকে না। স্মৃতিশক্তি পুরোপুরি গেছে। বয়সের জন্যে এটা হয়েছে। আমাকে দেখে যত কম বয়স মনে হয়, আসলে তা না। দশ হাজার একশ তেত্রিশ বয়স। যাই হোক, শোন নুহাশ, তোমার বাবাকে এনেছিলাম। লাভ কিছু হল না। কি করা যায় বল তো?

আমি জানি না।

একটা কিছু বুদ্ধি বের কর।

আমি ছোট মানুষ। আমার মাথায় কোন বুদ্ধি আসছে না।

ছোটদের মাথাতেই বেশি বুদ্ধি আসে। বুদ্ধি থাকে না বড়গুলির মাথায়। মানুষ যত বড় হয় তত বুদ্ধি কমে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ব্রেইন পচে গোবর সার হয়ে যায়। তা না হলে তোমার বাবা-মা এমন ঝগড়া করে?

নুহাশের চোখে পানি এসে গেছে। সে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে যাতে দৈত্য তার চোখের পানি দেখতে না পারে।

নুহাশ!

জ্বি।

কাঁদছ না-কি?

জ্বি– কাঁদছি।

কান্না বন্ধ কর। কেঁদে কখনো কিছু হয় না। বুদ্ধি বের করতে হবে। তোমার মাকে ভয় দেখালে কেমন হয়? সারারাত মারাত্মক ভয় দেখাব। ঠাণ্ডা পানি মাথার উপর ঢেলে দেব।

তাতে কি হবে?

ভয়ে হালুয়া টাইট হয়ে যাবে। তখন বুঝতে পারবে একা একা থাকা সম্ভব না। তোমার বাবাকে নিয়ে আসবে।

নুহাশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বাবাকে না এনে মা যদি অন্য। একটা লোককে বিয়ে করে ফেলে, তখন কি হবে?

দৈত্য মাথা দুলাতে দুলাতে বলল, হ্যাঁ এটা বিবেচনাযোগ্য সমস্যা। এই লাইনে চিন্তা করি নি। বয়সের কারণে আমার নিজের ব্রেইনও পচে গোবর হয়ে গেছে। তোমার মাকে ভয় দেখানো যাবে না। ভাল করতে গিয়ে হয়ে যাবে মন্দ। অন্য কিছু করতে হবে। আজ রাতটা ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করি কাল সমস্যার সমাধান করব। তুমি ঘুমিয়ে পড় খুকী।

আমার ঘুম আসছে না।

ঘুম তো আমারো আসছে না। ভাল ঘুম না হলে বুদ্ধি খুলবে না। কি করা যায় খুকী বল তো?

আমার সঙ্গে রান্নাবাটি খেলবেন?

রান্নাবাটি আমার কেমন খেলা?

আমি মিছিমিছি রান্না করব। সেগুলি আপনি খাবেন। খেয়ে বলবেন– মজা হয়েছে।

মন্দ না। খেলাটা ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। আস খেলা যাক।

নুহাশ সাদা কাগজ কুচিকুচি করে কাগজের ভাত রান্না করল। হলুদ কাগজ কুচিকুচি করে কাগজের ডাল রান্না করল। সবুজ কাগজ কুচিকুচি করে তৈরি হল সবজি। দৈত্যকে খেতে দেয়া হল। সে পুরোটা মুখে কচকচ করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল। নুহাশ হতভম্ব!

দৈত্য বলল, খেতে তো আসলেই ভাল লাগছে। বিশেষ করে সবজিটা খুবই চমৎকার হয়েছে। সবজি কি আরো আছে?

জ্বি-না।

আরো খানিকটা রেঁধে ফেল। দারুণ টেস্ট হয়েছে।

আপনি তো সত্যি সত্যি খেয়ে ফেলেছেন। মিথ্যা করে খেতে হয়।

দৈত্য অবাক হয়ে বলল, মিথ্যা করে আবার কিভাবে খায়? তোমার কথাবার্তা তো ভারী অদ্ভুত। যাই হোক, দয়া করে আরো খানিকটা সবজি রান্না কর। সবজি খেয়ে ঘুমুব। এমিতেও আমাদের সবুজ সবজি খাওয়া দরকার। ভিটামিন আছে।

৭. নুহাশের চোখ লাল

ভোরবেলা রেবেকা লক্ষ্য করল নুহাশের চোখ লাল। গা গরম। রেবেকা চিন্তিত হয়ে বলল, চোখ লাল কেন নুহাশ?

নুহাশ বলল, এম্নি।

রাতে ঘুম হয় নি?

হয়েছে।

গা গরম লাগছে। চিন্তার ব্যাপার হল তো। জ্বর সারছে না কেন?

মুনার-মা বলল, জ্বীন-ভূতের বাতাস লাগলে জ্বর সারে না।

তুমি চুপ কর মুনার-মা– জ্বীন ভূতের বাতাস বলে কিছু নেই।

না থাকলে নাই। আমার উপরে রাগ হল ক্যান। জ্বীন-ভূতের উপরে রাগ হইলে ভিন্ন কথা।

তোমার উপরে রাগ করি কারণ সুযোগ পেলেই তুমি নুহাশের সঙ্গে জ্বীন-ভূতের গল্প কর। গল্প করে করে ওর সাহস দিয়েছ কমিয়ে। ভীতুর একশেষ হয়েছে।

সাহস কমে নাই আম্মা। মাশাআল্লাহ্ সাহস বাড়ছে। কাইল রাইত একলা একলা ঘুমাইছে।

মুনার-মা!

জ্বি!

মুখে মুখে কথা বলতে হবে না।

জ্বি-আইচ্ছা।

আজ নুহাশকে স্কুলে নেবার দরকার নেই।

জ্বি-আইচ্ছা।

বিকেলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। ওর রিপোর্টগুলি সব আজ দেবে। রিপোর্ট নিয়ে ডাক্তারকে দেখাব। আর শোন, সদর দরজা সারাক্ষণ বন্ধ রাখবে। যেই আসুক দরজা খুলবে না।

আইচ্ছা।

মনে থাকবে তো?

থাকব।

নুহাশের বাবা এলেও খুলবে না।

এইটা কেমন কথা কন আম্মা?

তোমাকে যা করতে বলেছি করবে। নুহাশের বাবা এলেও দরজা খুলবে না। আমার অনুপস্থিতিতে এ বাড়ির দরজা খোলা হোক, তা আমি চাই না।

এইটা তো আম্মা সম্ভব না।

সম্ভব না কেন?

নুহাশ আফার আব্বা আসব, আর আমি দরজা বন্ধ কইরা থুমু। এইটা সম্ভব না।

সম্ভব না হলে তুমি চলে যাও। তোমাকে রাখাও আমার পক্ষে সম্ভব না।

জ্বি আইচ্ছা।

তুমি তোমার বিছানা-বালিশ নিয়ে আজ সন্ধ্যাবেলা চলে যাবে। আমি অন্য মানুষ রাখব।

আইচ্ছা। আমি নিজেও ঠিক করছিলাম যামু গিয়া। যে বাড়িতে শান্তি নাই হেই বাড়িত কামে আরাম নাই। ভালই হইছে।

রেবেকা অফিসে চলে যাবার পরপরই নুহাশ তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। চিকন গলায় ডাকল–আপনি কি এখনো ঘুমুচ্ছেন?

দৈত্য বলল, ঘুমুচ্ছিলাম। তোমার মার চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙেছে। মহিলা বিদেয় হয়েছেন?

হ্যাঁ।

দৈত্য খাটের নিচ থেকে বের হয়ে এল। তার মাথার চুল এখন সবুজ। ঝকঝকে সবুজ। নুহাশ অবাক হয়ে বলল, আপনার চুল সবুজ কেন?

কাল রাতে সবুজ রঙের সবজি খেয়ে এই অবস্থা। আমরা যখন যে রঙের খাবার খাই- মাথার চুলের রঙ হয় তাই। কাল রাতের সবজি হজমও হয় নি। পেটের ভেতর ভুটভুট শব্দ হচ্ছে মনে হচ্ছে ডাইরিয়া হয়ে যাবে।

ডাইরিয়া হলে অসুবিধা নেই–ওরস্যালাইন বানিয়ে আপনাকে খাওয়াব। কিভাবে বানাতে হয় আমি টিভি থেকে শিখেছি। এক মুঠ গুড় লাগে আর এক চিমটি লবণ। তারপর খুঁটা দিতে হয়। মুখে বলতে হয়, দিলাম টা–দিলাম গ্লুটা।

দৈত্য হেসে ফেলল। প্রথমে নিচু গলায়, তারপর শব্দ করে-হি হি হি। হো হো হো। হিহো হিহো হিহো।

রান্নাঘর থেকে মুনার-মা চেঁচিয়ে বলল, কে কে, হাসে কে?

নুহাশ বলল, আমি হাসছি আমি।

ছিঃ ছিঃ কেমন কইরা হাসেন। বুকের মধ্যে ধক কইরা উঠছে। মনে হইছে জ্বীন-ভূতে হাসে।

দৈত্য বিরক্ত হয়ে বলল-তোমাদের এই কাজের মেয়েটাকে বোকার হদ্দ বলে মনে হচ্ছে। জ্বীন-ভূতের হাসি আর দৈত্যের হাসি এক হল? কোথায় জ্বীন-ভূত আর কোথায় দৈত্য। কোথায় চড়ুই পাখি আর কোথায় উটপাখি। ঐ মহিলাকে একটা আছাড় দিতে ইচ্ছে করছে।

নুহাশ বলল, বুয়ার উপর আপনি রাগ করবেন না। বুয়া খুব ভাল।

আমি সহজে রাগ হই না। কিন্তু দৈত্যদের অপমান আমার পক্ষে সহ্য করা মুশকিল। যাক, বাদ দাও। তোমার সমস্যার সমাধান কি করে করা যায় তাই এখন জরুরী। অন্য কিছু তেমন জরুরী নয়। তোমার সমস্যার সমাধান হোক, তারপর ঐ মেয়ের কানের কাছে এমন হাসি দেব যে সে বুঝবে দৈত্যের হাসি কত প্রকার ও কি কি। আমি সব সহ্য করতে পারি, কিন্তু দৈত্য সমাজের অপমান সহ্য করি না।

নুহাশ বলল, আপনি এক গ্লাস পানি খান, তাহলে রাগ কমবে।

দাও, পানি দাও।

এক গ্লাস না, দৈত্য পুরো দু বোতল পানি শেষ করল। তার রাগ অনেকটা কমল। সে নিচু গলায় বলল, নুহাশ!

জ্বি।

তোমার সমস্যার সমাধান বের করেছি। তোমার মা যখন সকালবেলা তোমার অসুখ নিয়ে চেঁচামেচি শুরু করলেন তখনি সমস্যার সমাধান পেয়ে গেলাম।

কি সমাধান?

খুব সহজ সমাধান। তেমার মা তোমার রিপোর্টগুলি নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবেন। ডাক্তার সেই রিপোর্ট দেখে আঁৎকে উঠবেন।

আঁৎকে উঠবেন কেন?

আঁৎকে উঠবেন কারণ রিপোর্ট খুব খারাপ। রিপোর্ট দেখে মনে হবে তোমার ভয়ংকর এক অসুখ হয়েছে। এমন ভয়ংকর যে তুমি দুমাসের বেশি বাঁচবে না।

আমি কি দুমাসের বেশি বাঁচব না?

আরে না। তুমি বাঁচবে অনেক দিন। রিপোর্টগুলি বদলে দিতে হবে। খুব কঠিন কাজ। করতে হবে, উপায় কি?

তারপর কি হবে?

ডাক্তার সাহেব তোমার রিপোর্ট দেখে ভিরমি খেয়ে যাবেন। তোমার মাকে বলবেন। তোমার মা ভিরমি খাবে। পাগলের মত খুঁজে বার করবে তোমার বাবাকে। যাকে বলে মধুর মিলন।

আমার রিপোর্টগুলি আপনি কিভাবে বদলাবেন?

আছে, উপায় আছে। খুবই কঠিন কাজ, কিন্তু করা সম্ভব। লেখা বদলে দিতে হবে।

মুনার-মা বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, কার সাথে কথা কও আফা?

কারো সাথে না।

তুমি এমুন বিশ্রী কইরা হাসতাছিলা ক্যান?

আর হাসব না।

দৈত্য চাপা গলায় বলল, বিশ্রী হাসি কত প্রকার ও কি কি তোমাকে আমি বুঝিয়ে ছাড়ব। বদ মেয়েছেলে কোথাকার। দৈত্যের হাসিকে সে বলে, জ্বীন-ভূতের হাসি। কত বড় আস্পর্ধা।

নুহাশ বলল, আচ্ছা, আপনাকে আমি কি ডাকব? আপনার নাম কি?

দৈত্যদের কোন নাম হয় না। রাম দৈত্য, রহিম দৈত্য বলে কিছু নেই। দৈত্য হচ্ছে দৈত্য। মানুষদের মধ্যেও এই নিয়ম চালু হওয়া দরকার। মানুষ হচ্ছে মানুষ। নাম আবার কি? রহিমও যা করিমও তা।

নুহাশ বলল, আপনাকে ভাইয়া ডাকলে আপনি রাগ করবেন?

অবশ্যই রাগ করব। ন্যাকামি ধরনের ডাক আমার অসহ্য। ভাইয়া, আপুমণি ... ছিঃ ছিঃ!

আপনি এমন রেগে রেগে কথা বলছেন কেন?

দৈত্যদের রাগ ভয়ংকর জিনিস। একবার উঠে গেলে নামতে সময় লাগে।
উল্টা দিক থেকে গুনলে রাগ কমে যায়। আমি একটা নাটকে দেখেছি–১০০, ৯৯, ৯৮, ৯৭ এইরকম ...
দৈত্য সঙ্গে সঙ্গে বলা শুরু করল– ১০০, ৯৯, ৯৮, ৯৭, ৯৬, ৯৫, ৯৪...
নুহাশ বলল, রাগ একটু কমেছে?

দৈত্য হাসিমুখে বলল, একটু কম কম লাগছে। বুদ্ধি তো মন্দ না। রাগ বাড়ানোর উপায়টা কি? ঠিকমত গুনা– ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩ এ রকম?

রাগ বাড়ানোর কোন নিয়ম নাটকে দেখায় নি।

দৈত্য দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, প্রয়োজনীয় জিনিস কিছুই নাটকে থাকে না। অপ্রয়োজনীয় জিনিস থাকে। এই জন্যেই টিভি দেখা ছেড়ে দিয়েছি। রাগ কমানোর নিয়ম জানার কোন দরকার নেই। রাগ বাড়ানোর নিয়ম জানাটা অনেক বেশি দরকার।

আপনি যা রেগে আছেন। আপনার সঙ্গে কথা বলতেই ভয় ভয় লাগছে। আপনি বরং কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকুন।

এটা মন্দ না। বিশ্রাম দরকার, অনেক কাজ বাকি। বিকেলে তোমার মা তোমাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবার আগে সব কাজ সেরে রাখতে হবে। ঘণ্টাখানিক ঘুমিয়ে নিলে উত্তম হবে।

দৈত্য নুহাশের বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

৮. নুহাশের রিপোর্টগুলি

ডাক্তার সাহেব নুহাশের রিপোর্টগুলি একবার, দুবার, তিনবার উল্টে দেখলেন। একবার করে দেখেন আর তাঁর মুখ অন্ধকার হয়। তিনবার দেখার পর ডাক্তার সাহেবের চেহারাই পাল্টে গেল। তিনি কয়েকবার ঢোঁক গিললেন।

রেবেকা বলল, কি হয়েছে ডাক্তার সাহেব?

না-না, কিছু না।

রিপোর্ট দেখলেন?

হুঁ হুঁ দেখলাম।

সব ঠিকঠাক আছে তো?

ডাক্তার সাহেব আমতা আমতা করতে লাগলেন। রেবেকা বলল, কি হয়েছে আমাকে বলুন তো ডাক্তার সাহেব।

রিপোর্টগুলি ঠিক ইয়ে না।

ইয়ে না মানে কি? আপনি পরিষ্কার করে বলুন।

আপনি একটু পাশের ঘরে আসুন।

রেবেকা বুক ধক করে উঠল–ডাক্তার সাহেব এমন করছেন কেন? রিপোর্টগুলি কি খুব খারাপ? কি হয়েছে নুহাশের?

পাশের ঘরে গিয়েও ডাক্তার সাহেব চট করে কিছু বলতে পারলেন না। আমতা আমতা করতে লাগলেন। ঢোঁক গিলতে লাগলেন। রেবেকা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, কি হয়েছে আমার মেয়ের?

রিপোর্টগুলি ভাল না।

ভাল না মানে কি?

রেড ব্লাড সেলগুলি ডিফরমড।

তার মানে কি?

আপনাকে শক্ত হতে হবে। বিপদে মাথা খারাপ করলে চলবে না।

আমার মেয়ের কি হয়েছে বলুন?

এখন চট করে কিছু বলা ঠিক হবে না–আরো অনেক টেস্ট করতে হবে।

চিকিৎসা করলে আমার মেয়ে বাঁচবে কি বাঁচবে না, এইটা শুধু বলুন। যা চিকিৎসা করাতে হয় আমি করাব, যেখানে মেয়েকে নিতে হয় সেখানে নিয়ে যাব–আপনি শুধু বলুন আমার মেয়ে বাঁচবে কি-না ...।

ডাক্তার সাহেব নিচু গলায় বললেন, যা সন্দেহ করছি তা যদি হয় ... অবশ্য নাও হতে পারে ... মানে হায়াৎ মউত তো মানুষের হাতে না ... মানে ....

রেবেকা আর কিছু শুনল না। ঘর থেকে বের হয়ে এল। নুহাশকে নিয়ে রিকশায় উঠল। রেবেকা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নুহাশ বলল, কি হয়েছে?

রেবেকা কাঁদতে কাঁদতে বলল, কিছু হয় নি। মা শোন, আমার শরীরটা ভাল লাগছে না– চল আমরা দুজনে গিয়ে তোমার বাবাকে খুঁজে বের করে নিয়ে আসি।

নুহাশ মনের আনন্দ অনেক কষ্টে চাপা দিয়ে স্বাভাবিক গলায় বলল, এখন থেকে বাবা কি আমাদের সঙ্গে থাকবে?

রেবেকা চোখ মুছতে মুছতে বলল, হ্যাঁ আমাদের সঙ্গে থাকবে।

আমরা কি আগের বাসায় ফিরে যাব?

তুমি যদি চাও অবশ্যই ফিরে যাব। তুমি কি তা চাও মা?

হ্যাঁ চাই। আর কি চাই জান? আর চাই বাবা যখন জোছনা দেখতে যাবে তখন বাবার সঙ্গে তুমি আর আমিও যাব।

অবশ্যই যাব। অবশ্যই যাব মা।

.

নুহাশ তার ঘরে একা।

তার বাবা-মা পাশের ঘরে। নুহাশ ফিসফিস করে বলল, আলাদিনের চেরাগের দৈত্য, আপনি কি আমার একটা কথা শুনবেন?

প্রদীপের ভেতর থেকে উত্তর এল–কি কথা?

একটু বের হয়ে আসুন না।

না, এখন আর বের হতে পারব না। আরাম করে শুয়েছি। কি বলবে বল।

আমি আর মা গিয়ে বাবাকে নিয়ে এসেছি।

ভাল করেছ।

এখন বাবা-মা কি করছে জানেন? দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে।

উচিত শাস্তি হচ্ছে। আরো কাঁদুক। কাঁদতে কাঁদতে চোখে ঘা হয়ে যাক।

আমার খুব খারাপ লাগছে। ওরা ভাবছে আমি সত্যি সত্যি মরে যাচ্ছি।

ওরা যা ইচ্ছ ভাবুক, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাও তো। কালই এরা তোমাকে অন্য ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। সেই ডাক্তার বলবে তোমার কিছু হয় নি। তখন তারা আর কষ্ট পাবে না। একটা দিন তারা কষ্ট করুক। তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। কাজেই কিছু কষ্ট তাদের পাওনা।

দৈত্য ভাইয়া?

খবরদার বললাম, ভাইয়া ডাকবে না।

আপনি কি একটু বের হয়ে আসবেন? এক মিনিটের জন্যে?

কেন?

আপনাকে একটু দেখব। দেখতে ইচ্ছে করছে।

শোন নুহাশ। তুমি একটা সমস্যার মধ্যে পড়েছিলে। আমি তোমাকে সমস্যা থেকে মুক্ত করেছি। আমার কাজ শেষ হয়েছে। কাজেই তুমি আর আমাকে দেখবে না। এই যে কথা বলছি, আর কথাও বলব না। তুমি ভাল থেকো, কেমন?

নুহাশ খুব কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতেই সে বলল, আপনাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করছে দৈত্য ভাইয়া। একবার শুধু বের হয়ে আসুন। শুধু একবার। আর আপনাকে আসতে হবে না।

দৈত্য বের হল না। কোন শব্দও করল না। যারা অসম্ভব দয়ালু তাদের পক্ষেই অসম্ভব নিষ্ঠুর হওয়া সম্ভব।

.

অনেক রাত। বড় খাটের মাঝখানে নুহাশ, এক পাশে বাবা আর অন্য পাশে মা। নুহাশ বলল, বাবা অনুস্বার কবিতাটা একবার বল না শুনি।

মিনহাজ কবিতা শুরু করল:

নুহাশ আব্বুটিং
গোলটা চক্ষুং
হাসটুং করছিং
ফিকফিকিং
হাসটুং দেখং, আদর লাগছিং।

কবিতা শুনে নুহাশ হাসছে। আকাশে বিরাট চাঁদ উঠেছে। জানালা গলে সেই চাঁদের আলো এসে পড়েছে নুহাশের মুখে। গভীর আনন্দ এবং গভীর দুঃখে নুহাশের চোখ বারবার ভিজে উঠছে। চাঁদের আলোয় কি সুন্দর লাগছে নুহাশের কান্নাভেজা মুখ!

.

পরিশিষ্ট

নুহাশ এখন অনেক বড়। তার একটি ভাইও হয়েছে। মিনহাজ সাহেব তার নাম রেখেছেন প্লাটিনাম। প্লাটিনামকে নিয়েও তিনি একটি অনুস্বার কবিতা লিখেছেন। সেই কবিতাটি নুহাশের কবিতার মত এত সুন্দর হয় নি।

নুহাশ যদিও অনেক বড় হয়েছে (এবার এস.এস.সি. দেবে) তবু তার ধারণা ছোটবেলা আলাদিনের দৈত্য এসে তার সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। কেউ তার এই গল্প বিশ্বাস করে না। সবাই হাসে। সবার ধারণা, নুহাশ বানিয়ে বানিয়ে গল্পটা বলে। শুধু নুহাশের বাবা-মার ধারণা, নুহাশ পুরো ব্যাপারটা স্বপ্নে দেখেছিল। তবে একজন ডাক্তার প্রথমে যে বলেছিল, নুহাশের লিউকোমিয়া হয়েছে, পরে দেখা গিয়েছে এটা ঠিক না, তা কিন্তু সত্যি। নুহাশের লিউকোমিয়া (এক ধরনের রক্তের ক্যানসার) হয়েছে শুনেই যে তার মা নুহাশের বাবাকে নিয়ে আসেন তাও কিন্তু সত্যি। কে জানে হয়ত সত্যি সত্যি দৈত্য এসেছিল, কিংবা কে জানে হয়ত পুরোটাই শিশুমনের কল্পনা। শিশুদের কল্পনার শক্তি যেমন অসীম ঠিক তেমনি পৃথিবীর রহস্যময়তাও অসীম। এই রহস্যময় পৃথিবীতে অনেক কিছুই হতে পারে।